ভণ্ডের ভগবান

মানস ভট্টাচার্য্য

ভণ্ডের ভগবান

মানস ভট্টাচার্য্য

ভণ্ডের ভগবান

আমরা পারি। শুধু আমরাই পারি। বীর, তেজস্বী, অসাধারণ, রাজনীতিবিদ, দূরদর্শী, ধর্মরক্ষাকারী ও দুষ্কৃতির বিনাশকারী হিসাবে যার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, যিনি নিজে সারাজীবনের বেশীর ভাগ সময় লড়াই আর যুদ্ধ করে কাটিয়েছেন, একের পর এক দুর্বৃত্তকে বিনাশ করেছেন, গত ৫০০ বছর ধরে তার লীলাকে এমনভাবে আমরা কীর্তন করতে শুরু করলাম যাতে বর্তমান যুবসমাজ ভাবে গাছের ডালে বসে পা দোলাতে দোলাতে মেয়েদের চান করা দেখা আর মেয়েদের সঙ্গে ফস্টিনষ্টি করা ছাড়া তার কোনও কাজ ছিল না। জীবন যার বীরত্বময় আর যুদ্ধময় আমাদের পাল্লায় পড়ে সেই জীবন হয়ে উঠল। প্রেমময়, লীলাময় আর নারীময়। সারা জীবনে একটা নারীকে, নিজের স্ত্রীকে যিনি ঠিকমত সময় দিতে পারেননি তাকে ষোলোশ নারীর সঙ্গে নাচিয়ে দিলাম। তিনি নিজে কখনো কাউকে খোল-করতাল নিয়ে নাচগান করার পরামর্শ দেননি। অথচ সেটাকেই মুখ্য করে আমরা কাঁদতে লাগলাম। সেই যে কান্নার শুরু সেই কান্না আজও সমানে চলছে। অলীক অবাস্তব আর যুক্তিহীন কল্পনা মানুষকে কাঁদতে শেখায়। আমরা ভণ্ড। তাই ভক্তের ভগবান যখন ভণ্ডের ভগবান হয়ে ওঠে তখন কেঁদেই কেটে যায়। আমরা কাপুরুষ এবং দুর্বল চিত্ত। যৌনতা আমাদের মজায় মজায়। ভক্তের ভগবানকেও আমরা আমাদের মত বানিয়ে নিয়েছি। আমাদের ভণ্ডামির পাহাড় প্রমাণ ছাই-এর আড়ালে চাপা পড়ে গেছে ভগবান। আর কিছুতেই মাথা তুলতে পারছে না।

আমি কেষ্টঠাকুর, নাড়ুগোপাল বা গোপালঠাকুর নয়—আমি শ্রীকৃষ্ণের কথা বলছি। ভারতের ভগবানকুলের অন্যতম চরিত্র। অসাধারণ বীর এবং বাগ্মী। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা। অত্যন্ত যুক্তিবাদী। জীবন ও সমাজ কেমন হবে তীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে গীতায়। প্রচণ্ড অস্থির সময়েও কি করে মাথা ঠান্ডা রাখতে হয় তা বলেছেন কুরুক্ষেত্রের মত এক যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে। তার এই চরিত্র আমাদের পছন্দ হয়নি। ভক্ত নয় বলে হয়নি। আমরা ভণ্ড। ষণ্ড মানে যদি ষাঁড় হয়, তাহলে ভণ্ড মানে ভাঁড় হতে পারে। কৃষ্ণকে নিয়ে আমাদের সেই ভণ্ডামো বা ভাঁড়ামো চলছে দীর্ঘদিন ধরে।

আমরা জানি ভাবনা আমাদের প্রভাবিত করে। কেউ যদি সর্বদা ভাবে আমি চোর হবো সে চোর হবেই। কেউ যদি ভাবে আমি ভালো হবো, আমাকে ভালো হতে হবে তাহলে সে ভালো হবেই। গত ৬০০ বছর ধরে একদল মানুষ ভাবছেন জগতে একমাত্র কৃষ্ণই পুরুষ আর সব নারী। এরকম ভাবতে ভাবতে গোটা ভারতের বেশীর ভাগ অংশ নারীতে পরিণত হয়েছে। দেখতে শুনতে পুরুষের মতো কিন্তু পৌরুষ নেই, তেজ নেই, দীর্ঘদিন ধরে ভাবছে আমরা তো কেউ পুরুষ নই কৃষ্ণ একমাত্র পুরুষ। এরকম ভাবতে ভাবতে নিজেরাই কখন পৌরুষ হারিয়েছি সে হুঁশ নেই। পুরুষ যদি নারী হবার চেষ্টা করে তাহলে নারীও হয় না পুরুষও হয় না। এই মাঝামাঝি লোকের ভিড়ে ভরে গেছে ভারতবর্ষ। চারপাশের অন্যায় সয়ে সয়ে আমাদের পিঠে ঘা। চারপাশে ভন ভন করে বেড়াচ্ছে বিষাক্ত মাছি। তবুও আমাদের চিন্তা নেই চেতনা নেই। আমরা শুধু কৃষ্ণের নামে হাউ হাউ করে কাঁদছি। ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে সেকি হাপুস নয়নে কান্না, দুহাত তুলে কেঁদেছি। সেই সুযোগে আমাদের কাপড় খুলে নিয়ে পালাচ্ছে দুষ্কৃতিরা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানের অর্ধেকটাই দুস্কৃতিরা দখল করে নিয়েছে। তবুও আমরা কাঁদছি, ভাবছি কৃষ্ণ বড় খুশি হচ্ছেন। কৃষ্ণ জানেন এরা কাপুরুষ। এদের দিয়ে কিস্যু হবে না। তিনি মুচকি হাসছেন এদের ভণ্ডামো আর নপুংসতা দেখে।

এইসব কৃষ্ণ ভক্তরা মিথ্যার জাহাজ। বীর আর সাহসী কৃষ্ণের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পুরো জীবনটাকেই ভণ্ডামি দিয়ে আর মিথ্যা দিয়ে চাপা দিয়েছেন। যে কোন টিকিধারী নামাবলীধারী কপালে রস তিলকধারী কৃষ্ণ ভক্তকে জিজ্ঞাসা করুন—আচ্ছা পৃথিবীতে কৃষ্ণ জন্মেছিলেন কেন—অমনি চটপট জবাব কেন লীলাময় এসেছেন লীলা করার জন্য। এই চূড়ান্ত মিথ্যাটি বহুবার বহুজনকে বলতে শুনেছি। প্রেমাবতার প্রেম ছড়াবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। মানুষও গোগ্রাসে গেলে এসব, অথচ শ্রীকৃষ্ণ নিজে

কি বলেছেন তা আমরা পাত্তাই দিই না। কেন ভগবান জন্ম নেন স্পষ্ট করে বলা আছে গীতায়। শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলেছেন—দুস্কৃতির বিনাশ আর সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য তিনি জন্ম নেন। অধর্ম নাশ করে ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য তিনি আসেন। কোন ভণ্ডামো নেই, কোন লুকোছাপা নেই, শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছেন স্পষ্ট বলেছেন, বলেছেন বীর অর্জুনকে, তাহলে কোন বৈষ্ণব ভক্তের কানে কানে তিনি বলতে গিয়েছিলেন যে, আমি লীলা করতে আসি। অথচ কৃষ্ণের এ কথাটা আমরা প্রচার করিনি কারণ দুষ্কৃতি বিনাশ বা ধর্মসংস্থাপন করতে গেলে সাহস দরকার পৌরুষ দরকার। তার চেয়ে লীলা অনেক সহজ। রস আছে, তাই বারবার লীলার মতো মিথ্যাকথা আওড়ে চলি।

শ্রীকৃষ্ণের ছোটবেলা নিয়েও আমাদের ভণ্ডামোর শেষ নেই। বিভিন্ন বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো থাকে নাদুস-নুদুস গোপালের ছবি। কোথাও ননী চুরি করছে। কোথাও মাখন চুরি করছে। হাতে মুখে লেগে আছে চুরি করে খাওয়া ননী আর মাখন। বাড়ির ছোটছেলেরা আচার বা বিস্কুট চুরি করে খেলে বকুনির অন্ত নেই, অথচ ঘরের দেওয়ালে টাঙানো চোর কৃষ্ণের ছবি, বিভিন্ন মন্দিরেও, যেন চুরি করে খাওয়াটাই কৃষ্ণের ছোটবেলার প্রধান ঘটনা। আমরা আমাদের স্মরণীয় ঘটনাগুলিকেই ছবি করে তুলে ধরে রাখি। কৃষ্ণের ছোটবেলার ছবি দেখলে মনে হবে ননী আর মাখন চুরিই তার শিশুকালের প্রধান ঘটনা। অথচ বাস্তববুদ্ধি অন্য কথা বলে। ছোটবেলাতেই পুতনা বধ, বকাসুর বধ, যমুনায় কালীয় দমন করে রমনক দ্বীপে পাঠানো, তৃণাবর্ত বধ। এমন নানা বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনা জড়িয়ে আছে শিশু কৃষ্ণের জীবনের সাথে। অথচ আমরা এগুলিকে পাত্তা দিই না। তার চেয়ে যশোদা ভগবানের কান ধরে আছে এ ছবি আমাদের অনেক বেশি পছন্দ। আর আমাদের সবচেয়ে পছন্দের নাড়ুগোপাল গোপালঠাকুর। হাতে মণ্ডা, নিদেনপক্ষে নকুলদানা নিয়ে বসে আছেন। আমরা ভণ্ড এবং কাপুরুষ তাই কৃষ্ণের শিশুকালের বীরত্বব্যঞ্জক জীবনকে ঢেকে দিয়েছি নাড়ু আর ননী মাখন দিয়ে, বীরত্বকে ঢেকে দিয়েছি দুর্বলতা আর কাপুরুষতা দিয়ে, মেয়েলি ন্যাকামো দিয়ে।

কৃষ্ণের জন্ম নিয়ে আমাদের হাজার গালগল্প। সেইসব গল্পে আমরা বুঁদ হয়ে থাকি। বাস্তবটাকে এড়িয়ে চলি, সত্যকে খোঁজার কোনও চেষ্টাও করি না। আমরা কিছুতেই বুঝিনা যে শুধুমাত্র লীলা করার জন্য টুক করে ভগবান আকাশ থেকে ঝরে পড়েননি। অন্যান্য আর পাঁচটা শিশুর মত নিয়ম মেনেই তার জন্ম হয়েছে। দেবকীকেও ১০ মাস ১০ দিন গর্ভধারণ করতে হয়েছে। নিদারুণ দুঃখ আর যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে কারাগারের মধ্যে, পৃথিবীতে আসতে গেলে ভগবানকেও যে পৃথিবীর নিয়ম মেনে চলতে হয় এটা তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কংসের হাত থেকে বাঁচাতে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে যমুনা পার করে গোকুলে লুকিয়ে রেখে আসতে হয়েছে। অথচ এই বাস্তবকে ভুলে তার যাবতীয় দুঃখ কষ্টকে ভুলে আমরা মনে রাখলাম ননী চোরা কৃষ্ণকে, তাকে পৃথিবীতে আনার জন্য কারাগারের মধ্যে দিনরাত কাটানো গর্ভবতী দেবকীকে ভুলে গেলাম। মনে রাখলাম যশোদাকে। যাকে তেমন কোনও কষ্টই করতে হয়নি। হাতে পায়ে শিকল বাঁধা বসুদেবকে ভুলে গেলাম। মনে রাখলাম বর্ধিষ্ণু নন্দরাজকে। কৃষ্ণ বসুদেবের পুত্র এই পরিচয় ভুলিয়ে দিলাম অর্ধেকের বেশি লোককে। কৃষ্ণ হয়ে গেলো নন্দলালা, আর যশোদা নন্দন আমাদের ভণ্ডামি আর গালগল্পের পরিমাণ বেশি বলে। দেওয়ালের গোপালঠাকুর আর ননীচোরার ছবি দেখিয়ে এমন করলাম যে তার ছোটবেলার বীরত্বের কথাগুলি ভুলেই গেলাম।

এখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে জন্মাষ্টমী হয়। সরকারিভাবে ছুটি থাকে অনেক জায়গাতেই, বিভিন্ন জায়গায় যে উৎসব হয়, তার মূলে হরিনাম আর দইয়ের হাড়ি ভাঙা। ছোট ছোট ছেলেদের হাতে বাঁশি আর মাথায় ময়ূরের পালক গুঁজে ননী মাখন খাওয়ানো হয়। এমন গোপালঠাকুর এখন ঘরে ঘরে। হরিনামের চোটে উঠোন কাদা। দই হলুদে মাখামাখি। অথচ কৃষ্ণের জন্মদিনে অন্যরকম শপথ নেওয়ার কথা ছিল। শ্রীকৃষ্ণ যেখানে জন্মেছিলেন সেই মথুরার কারাগার আমাদের প্রাণের ধন। সব মুসলমানের যেমন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য জীবনে অন্তত একবার মক্কায় হজ করতে যাওয়া। তেমনই প্রত্যেক কৃষ্ণভক্তের উচিত ছিল জীবনে একবার ভগবানের জন্মস্থানে যাওয়া। যাবেন কোথায়? যে

কারাগারে তার জন্ম হয়েছিল সেটাইতো এখন অন্যধর্মের দখলে। হাজার হাজার বৈষ্ণব অথবা কৃষ্ণভক্ত জন্মাষ্টমীতে দুহাত তুলে নেচে নেচে কাঁদতে পারেন। কিন্তু কৃষ্ণের জন্মস্থান উদ্ধারের কোন চেষ্টা করতে পারেন না। কৃষ্ণভক্তদের এগুলো শুনতে খারাপ লাগবে, কারণ এটাই নির্মম সত্য। এর মধ্যে ভণ্ডামি নেই। রসের গল্প নেই। এদের পাল্লায় পড়েই ভক্তের ভগবান ভণ্ডের ভগবান হয়েছে। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ভক্তির সাইনবোর্ড। কারও সরু টিকি কারও মোটা টিকি। এদের জিজ্ঞাসা করুন—ভগবান কৃষ্ণের পূতাঃ পবিত্র জন্মস্থান অন্যের দখলে গেল কেন। আপনারা তার ভক্ত হয়ে উদ্ধারের চেষ্টা করছেন না কেন। আমনি ভক্ত বলবে এসবই তো তেনার লীলা। উত্তর একেবারে রেডি। সত্যের মুখোমুখি হলে এমনই হয়। লীলা কি দাদ হাজা চুলকানি নাকি। যখন খুশী যেখানে খুশী হবে। ভক্তদের হবে, ভগবানের হবে, ভক্ত না হয়ে ভণ্ড হলে এমনই হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর আর যৌবনকে আরও নীচে নামিয়ে এনেছি। সমগ্র যুবসমাজের কাছে হাসির খোরাক করে তুলেছি। ভগবানকে। দোষ যুবকদের নয়। কৃষ্ণভক্তদের। কৃষ্ণের কৈশোর আর যৌবনকে আমরা গত ৫০০ বছর ধরে এমনভাবে তুলে ধরেছি যেন কৃষ্ণ একটা লুমপেন। যার চরিত্র বলে কিছু ছিল না। যার প্রধান কাজ ছিল মেয়েদের সঙ্গে স্ফূর্তি করা। স্নানের ঘাটে মেয়েদের কাপড় চুরি। পরের বউকে নিয়ে টানাটানি। লুকিয়ে তার সঙ্গে ক্রীড়া। হ্যাঁ এভাবেই উপস্থাপিত করেছি কৃষ্ণকে। যা সত্যের একেবারে বিপরীত। চরম এবং চূড়ান্ত মিথ্যাকথাগুলিকে শ্রীকৃষ্ণের জীবনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভগবানের লীলা বলে এই কাজকে সমর্থনও করা হয়। ছোট থেকে বড় এখন, সবাই আমরা সেই প্রভাবে প্রভাবিত। পথে ঘাটে স্কুলে কলেজে সর্বত্র এসব নিয়ে হাসিঠাট্টা। আমরা শুনি। কৃষ্ণভক্তরাও শোনে। হজম করতে হয়। কারণ ভণ্ডামি ঢাকতে এসব হজম করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। কোন ছেলে যদি তার বান্ধবীদের সঙ্গে গল্প করে অমনি আমরা বলি—কিহে তুমি তো কলির কেষ্ট। এগুলো পরিচিত বাক্যবন্ধনী। অনেকেই শুনি। অনেকেই বলি। একবারও ভাবি না কি বলছি, কেন বলছি। একথা বলে কি আমরা এগুলোই বোঝাতে চাই যে মেয়েদের সঙ্গে বসে গল্প করা ছাড়া আর কোনও কাজ ছিল। না। অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তাকে কৃষ্ণভক্ত বলি না। ভণ্ড ভক্তরা বলেন প্রেমময়ের লীলা। স্বর্গে কি অপ্সরার অভাব ছিল। মর্ত্যে আসতে হলো মেয়েদের সঙ্গে গল্প করার জন্য। কিছুতেই সত্য স্বীকার করব না। আমাদের হাড়ে মজ্জায় শিরায় শিরায় এই ন্যাকামি চলছে দীর্ঘকাল ধরে। তাই সিনেমা নাটক গান সর্বত্র কৃষ্ণের কৈশোর যৌবনকে নিয়ে চূড়ান্ত ছ্যাবলামো চলছে। বিকৃতভাবে গাওয়া হচ্ছে ভজ গৌরাঙ্গ। সিনেমায় গোঁফধারী কৃষ্ণ কুঞ্জবনে বসে বসে সিগারেট ফুঁকছে আর রাধাকে চুমো খাচ্ছে। এসব দেখে কোনও কৃষ্ণভক্ত প্রতিবাদ করেন না। কারণ নপুংসকেরা প্রতিবাদ করতে ভয় পায়। লাগাতার ভণ্ডামো মানুষকে কাপুরুষ করে তোলে। নিজেদের এই বীর্যহীনতা আর মিথ্যাচারিতাকে সমর্থনের জন্য হাজার যুক্তি। আসলে সত্যের মুখোমুখি হতে হলে সাহসী হতে হবে। বীর্যবান হতে হবে। নির্ভীক হতে হবে। আমরা অসৎ। আমাদের বেশিরভাগের চরিত্র দুর্বল। তাই বীর্যবান তেজস্বী কৃষ্ণও আমাদের পছন্দ নয়। আমরা আমাদের ভগবানকেও আমাদের মতো বানিয়ে নিয়েছি। নিজেদের অবদমিত ইচ্ছাগুলো চাপিয়ে দিয়েছি। ভগবানের উপর। নিজেরা মেয়েদের চান করা দেখতে গেলে লোকে ঠ্যাঙাবে। তাই ভগবানকে দিয়ে দেখিয়েছি। পরের বউ এর সাথে প্রেম করলে ধরা পড়ার ভয়, ভগবানের প্রেম বলে চালিয়ে দিচ্ছি। বয়সকালে একটা মানসিক তৃপ্তিতো পাওয়া যাচ্ছে। ভক্তিও হলো আবার তৃপ্তিও হলো। এমন বাড়ি খুব কমই আছে যেখানে রাধাকৃষ্ণের ছবি নেই। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি তো প্রায় সব বাঙালি বাড়িতে। শিখিপুচ্ছধারী বাঁশিধারী কৃষ্ণের পাশে রাধা। এ ছবি আমাদের চিরচেনা। এখনতো এমন অনেক সংগঠন আছে যারা কৃষ্ণের থেকে রাধাকে বেশি গুরুত্ব দেন। আমরা যদি গালগল্প ভালো না বাসতাম তাহলে কখনই এগুলো সম্ভব হতো না। তমাল তলায় কৃষ্ণ রাধাকে নিয়ে দোল খাচ্ছে এটা ভাবতে ভালো লাগে। কিন্তু যুক্তিতে টেকে না। একবারও ভাবিনা কৃষ্ণের গোটা যৌবনটা যদি রাধাকে নিয়ে দোল খেতে খেতে কেটে গেল তাহলে এত যুদ্ধবিগ্রহ, কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধবধ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধপরিচালনা এসব কখন করলেন। দুটো চরিত্রকে মেলানো যাবে কি

ভাবে, যাঁর জন্ম দুস্কৃতিদের বিনাশ আর সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, তিনি রাধা নামের এক পরস্ত্রীকে নিয়ে তমালগাছে দোল খাবেন এতো অতি বড় কষ্টকল্পনা। তবুও আমাদের ছেলেমেয়েদের মন থেকে কৃষ্ণের সেই তেজস্বী রূপটাকেই মুছে দিতে পেরেছি। আমাদের দীর্ঘদিনের ভণ্ডামো আর মিথ্যাচারিতা দিয়ে। দাদের ধারে ধারে চুলকেও তৃপ্তি।

প্রায় বছর দশেক আগের কথা। এক কৃষ্ণভক্তের বাড়িতে বসে আছি। তার বাড়ির দেওয়ালে রাধাকৃষ্ণের ছবি। যেমন থাকে জড়োজড়ি করে, রাধার প্রায় শিথিল বসন, হঠাৎ ক্লাস ফাইভে পড়া ছেলেটি তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করে–আচ্ছা বাবা রাধা কি কৃষ্ণের বউ। বাবা নিরুত্তর, অনেক কষ্টে ঢোক গিলে বলেন না রে বউ নয়। ছেলের মা বাবা পরস্পরের দিকে তাকায়। নাইনে পড়া দিদি পড়া ছেলে উঠে এসে বলে–তুই জানিস না রাধা কৃষ্ণের মামিমা ছিল। ছেলে বলে তাহলে ওরকম জড়িয়ে ধরেছে কেন, বাবা মা নিরুত্তর। আসলে আমাদের প্রতিক্রিয়া যে কি সুদূরপ্রসারী হতে পারে তা ভাবি না। আমরা নব নব তত্ত্বের অবতারণা করি। আমরা বলি রাধাই কৃষ্ণের শক্তি, আবার সেই শক্তির নানা নাম দিই। শিশু কিশোররা এসব শক্তিও বোঝেনা, তত্ত্বও বোঝেনা। ছোট থেকে ওই ছবি দেখতে দেখতে তাদের মনে আঁকা হয় কৃষ্ণ বনে বনে বাঁশি বাজেয়ে ঘুরে বেড়াত, আর নিজের মামিমার সঙ্গে ফস্টিনস্টি করত। সেটাই তাদের মনে থাকে সারাজীবন। আমি জানি কৃষ্ণভক্তরা এসব শুনে রেগে যাবেন। কারণ এগুলো সত্য,সত্য শুনলে সবার রাগ হয়। খোঁড়াকে খোঁড়া বললে, কানাকে কানা বললে রেগে যায়। সুতরাং এসব শুনে ভণ্ড ভক্তরাও রেগে যাবেন। কৃষ্ণের জীবনে আদপে রাধার অস্তিত্ব ছিল কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে। রাধাতত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করার জন্য আলাদা একটা বই লেখা যায়। কৃষ্ণের জীবনে যে রাধার বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই তাও প্রমাণ করা যায়। অথচ আমরা সেই গালগল্প বিশ্বাস করি। আমরা মুখে বলি 'যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে' অর্থাৎ মহাভারতে যা নেই তা ভারতবর্ষে নেই। মহাভারতের প্রতিটি পাতা আঁতিপাতি করে খুঁজেছি। কোথাও রাধার নাম পর্যন্ত নেই। অথচ রাধা ছাড়া বাকি অনেকের আছে। কৃষ্ণের জীবনদর্শন গীতা। গীতা সারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গীতার কোথাও রাধা নেই। অথচ এমন নয় যে মহাভারতে কোথাও রাধার নাম উল্লেখের জায়গা ছিল না। নারদ নিয়ে যাচ্ছে কৃষ্ণকে। গোকুল থেকে। সকলে আকুল। সত্যভামা রুক্মিণীসহ অনেকের নাম আছে। রাধা নেই। পাণ্ডবদের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে গোকুলে যাচ্ছেন কৃষ্ণ। নিজের বাবামা পালিত বাবা মার জন্য মন খারাপ। আরও অনেকের জন্য মন খারাপ। রাধার নাম নেই, মহাভারতের শেষ পর্বে কৃষ্ণের বহু প্রিয়জন বহু সখীর নাম আছে। রাধার নাম নেই। তার মানে কৃষ্ণের জীবনে রাধাপ্রক্ষিপ্ত। আমাদের অবদমিত মনের ফসল। কৃষ্ণের রাধাপ্রেম ঝুলন খেলা এসব গল্প, সত্য নয়। অথচ সেই গল্পেই আমাদের বিশ্বাস। আর গল্পের গরু যেমন গাছে ওঠে তেমনই রাধার গল্প বিশ্বাস করানোর জন্য আরও গল্প আরো বর্ণনা। বীরপুরুষকে কাপুরুষ বানানো ঠিক আমাদের মত করে।

যে রাধার অস্তিত্ব শুধু গালগল্পে সেই রাধার জন্য ভগবানকে দিয়ে কি না করিয়েছি। শেষে পা পর্যন্ত ধরিয়েছি। 'দেহি পদপল্লব মুদারম' , শুনে আমরা গদ গদ হই। অনেকের দুচোখ বেয়ে গড় গড় করে জল পড়ে। ভাবিনা যে কৃষ্ণের মতো বীরপুরুষ এমন পায়ে ধরতে যাবেন কেন। সত্যভামা পারিজাত চেয়েছিল। ইন্দ্রের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ করে ফুলসুদ্ধ পারিজাত গাছ এনে পুঁতে দিলেন সত্যভামার দরজায়। বীর যুবকের মতো কাজ। কিন্তু কঠিন, তাই আমরা সেটা ভুল গেলাম, তার থেকে পা ধরা অনেক সহজ সেটাকেই গ্রহণ করলাম মনে প্রাণে। ভণ্ডামির চূড়ান্ত।

এখন যদি কেউ বলেন রাধা আর কৃষ্ণের প্রেমকাহিনীকে নিয়ে অসংখ্য উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে তবে তাকে নিশ্চয় স্বীকার করতে হবে। একথা সত্য যে রাধা কৃষ্ণের প্রেমভাব সংস্কৃত আর বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে। সেখানে গোল বেঁধেছে ওইসব সাহিত্যকে ধর্মের সঙ্গে এক করে দেওয়ায়। রাধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য বক্তৃতার ফুলঝুরি ছোটে বৈষ্ণব গুরুদের মুখে। মূলত তিনটি যুক্তি দেন। এক, রাধা কৃষ্ণের শক্তিস্বরূপা। দুই, এই দুইয়ে কোন ভেদ নেই। রাধাকৃষ্ণ অভেদ। তিন,

জগতে প্রেমের বিস্তারের ক্ষেত্রে রাধা প্রেমের বড়ো ভূমিকা আছে। বার বার এগুলি শুনি। আমাদের বোঝানো হয় যে রাধাকৃষ্ণের প্রেম নাকি অধ্যাত্মভাব ভক্তি আর প্রেমের সঞ্চার করে। এগুলো সব আবেগের কথাবার্তা। ভাবের ভক্তির বা ভণ্ডামির কথাবার্তাও হতে পারে। কারণ এর সারবত্তা যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা হয় না।

শিশুকাল থেকে পূর্ণযৌবন পর্যন্ত কৃষ্ণ অনেক যুদ্ধ করেছেন। শেষে ব্যাধের তীরের আঘাতে মরেও গেছেন। যা করেছেন নিজের শক্তি প্রতিভা সাহস আর ক্ষমতা দিয়ে। কোথাও বলেননি রাধাই আমার শক্তি। কোথাও রাধার নামই করেননি। কাউকে বধ করতে যাবার আগে রাধার আরাধনা করেননি। একবারের জন্যও বলেননি, হে রাধা আমাকে শক্তি দাও। রাধা যদি শক্তিস্বরূপা হতো তাহলে কায়দা করে জরাসন্ধকে, সুদর্শন চক্র দিয়ে শিশুপালকে, ক্ষমতা দিয়ে কংসকে মারার দরকার হতোনা। ভীম যখন জরাসন্ধকে কিছুতেই মারতে পারছেন না তখন তিনি নিশ্চয় বলতেন—ভীম তুমি ১০৮ বার রাধা নাম জপ করো তাহলেই জরাসন্ধ হত হবে। শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতে বা গীতায় একবারও স্বীকার করেননি যে রাধাই তার শক্তি। কারণ এগুলো সত্য নয়। শ্রীকৃষ্ণ যা বিশ্বাস করেননি আমরা তা বিশ্বাস করি। শ্রীকৃষ্ণ বাস্তববাদী ও যুক্তিবাদী। আমরা আবেগবাদী ও মিথ্যাবাদী।

অনেক বৈষ্ণব পণ্ডিত বলেন—রাধাকৃষ্ণ অভেদ। আরেক প্রবঞ্চনা। কৃষ্ণের জন্ম হয়েছে মানুষের গর্ভে তেমনই রাধারও হয়েছে। দুজনেরই বাবা মাও আলাদা। লিঙ্গও আলাদা। গায়ের রং আলাদা। এমনকি চিন্তাভাবনাও আলাদা। তাহলে অভেদ কিসে। জানি ভণ্ডরা কি বলবেন। বলবেন সেটা বোঝাই তো লীলা। সেই একই চুলকানি। যা বুঝতে পারো না তাই লীলা। আগে বিভিন্ন ছবির প্রদর্শনীতে ছবি দেখতে যেতাম। অনেক ছবি বুঝতাম না। সহপাঠীরা বলতে ABSTRACT আর্ট। এই অভেদতত্ত্বও তাই। যুক্তি তর্কের বাইরে। অথচ কৃষ্ণ বরাবর যুক্তিবাদী। তা সে রাজসভাতেই হোক বা যুদ্ধক্ষেত্রেই হোক। সবসময় সর্বত্র যুক্তি দিয়েছেন। আমরা যুক্তিহীন। আমরা একবারও প্রশ্ন তুলি না। ব্রহ্মবৈবর্ত নামে একটি পুরাণ আছে। সেখানে আবার রাধাকৃষ্ণের বিয়ে এবং বিয়ের পর সারারাত কাটানোর সরস গল্পও আছে। বৈষ্ণব পদাবলীর ছত্রে ছত্রে যে রাধাপ্রেমের ঘনঘটা তা কোন্ অভেদতত্ত্ব প্রমাণ করে। তা তো আমার আপনার বাড়ির ছেলেমেয়েদের মতই। নেহাত তখন মোবাইল ছিলনা, নাহলে বড়াইবুড়ির দরকার হতো না। সুতরাং অভেদ তত্ত্ব ধোপে টেকে না।

বৈষ্ণব কুলশিরোমণিদের তৃতীয় যুক্তি—রাধাকৃষ্ণের প্রেম নাকি জগতে সমাজে প্রেমের সঞ্চার করে। বুদ্ধি যখন বাস্তবতা হারায় তখন এমন চিন্তাই আসে। গত ৫০০ বছরের বেশিসময় ধরে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গল্প শুনে আসছে। মানুষ। তাহলে পৃথিবীতে এত বিদ্বেষ কেন, এত হিংসা কেন। এত যদি প্রেমের ঘনঘটা তাহলে ভারতবর্ষে আজ এত প্রেমের অভাব কেন। জীবনানন্দের মত কবিকেও কেন লিখতে হয়—জ্ঞান নেই আজ এই পৃথিবীতে জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই। রাধাকৃষ্ণের নামে দেশ জুড়ে প্রেম বিলিয়ে বেড়ান তাদের বেশিরভাগ এত রুক্ষ মেজাজী কেন। ভক্তে ভক্তে এত হানাহানি কাটাকাটি কেন। গরিব বড়লোকে এত পার্থক্য কেন। আমি জানি এইসব কেনর উত্তর বৈষ্ণব বাবাজীরা এককথায় দেবেন—সবই লীলা। সেই একই উত্তর চুলকানি। আমাদের একবারও মনে হয় না ভগবান নিজে যাকে যেমন তাকে তেমন শাস্তি দিয়েছেন, নিজে বলেছেন আমি দুষ্ট লোকেদের মারতে এসেছি—সেই ভগবান অন্ততঃ অহেতুক প্রেম ছড়ানোর কথা বলবেন না। ভগবান না বলছেন তো কি হয়েছে আমরা বলছি, কারণ প্রেমের এই ধাপ্পাবাজিটা আমাদের ভালো স্যুট করে। তাতে সমাজের যা হচ্ছে হোক। আমার তো মানসিক তৃপ্তি। কৃষ্ণ হতদরিদ্র সুদামাকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। এদেশের বেশিরভাগ বৈষ্ণবগুরু গরিব দরিদ্রের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলেন। স্টেজে উঠলেই আবার সেই বস্তাপচা প্রেমের গল্প। এমনই চলছে শতশত বছর ধরে। ভণ্ডামো আরমিথ্যাচারিতার ধারাবাহিকতা। এ সিরিয়াল চলছে দিনের পর দিন।

রাধা মহাভাবস্বরূপিণী অথবা মহাশক্তির দ্যোতক এসব তো নিছকই কল্পনা বলে মনে হয়। আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথাও হতে পারে। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে রাধার কোন মহাভাবের অথবা মহাশক্তির পরিচয় তো

আমরা পাইনি। বৈষ্ণব পদাবলীর ছত্রে ছত্রে রাধার যে প্রেম তাতো নিছক একালের কলেজে পড়া প্রথম বর্ষের মেয়েদের মতো। 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে শুনে মন ভোর-প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর'। এ তো স্রেফ শরীরী প্রেমের ঘনঘটা। একালের অবুঝ কলেজ ছাত্রীরা যেমন বাবা-মা'কে লুকিয়ে রাত জেগে মোবাইল অথবা ফেসবুকে প্রেম করে এ তো তেমনিই। রাতের অন্ধকারে অভিসারে। এর মধ্যে কোন গভীর তত্ত্ব সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। সাধারণ দৃষ্টিতে যা ধরা পড়ে না, সমাজের বা সাধারণ মানুষের যা কাজে লাগে না তা নিয়ে বেশি মাতামাতি করে লাভ কি? রাধার এই লালসা তো চণ্ডীদাসও ধরতে পারেননি। তিনি তা নিজেই লিখেছেন ''বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী অভিলাষে—তাহে কুলবধূ বালা, কিবা অভিলাষে রচয়ে লালসে—না বুঝি তাহার ছলা। '' সুতরাং প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষকে এই দুর্বোধ্য বাস্তবতত্ত্ব বোঝানোর চেষ্টা তো নিরক্ষর মানুষকে 'বিগব্যাং থিয়োরী' বোঝানোর মতো। রাধার মহাভাব স্বীকার করলে একালের সব কলেজ ছাত্রীই রাধিকা। বরং তাদের ভাব আরও প্রবল। রাধার প্রেমের মধ্যে তাও একটু ভয় ছিল। এখনকার মেয়েদের মধ্যে সেই ভয়টুকুও নেই।

রাধা মহাশক্তিস্বরূপা। রাধাই কৃষ্ণের শক্তি। এর যুক্তি কোথায়। রাধার যে লীলা, তার যে জীবন সেখানে শক্তির প্রকাশ কোথায় তা অন্ততঃ বাহ্যদৃষ্টিতে চোখে পড়ে না। লুকিয়ে ভাগনের সঙ্গে প্রেম করার মধ্যে অন্তত সামাজিক দৃষ্টিতে কোন মহাশক্তি চোখে পড়ে না। রাধা কোন অসুর বধ করেছিলেন অথবা সামাজিক ভাবে কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন, সমাজ গঠনে সাহায্য করেছিলেন এমন কোন শক্তির প্রকাশ আমরা দেখি না। আমাদের বাড়ির মেয়েরা যে ছেলের সঙ্গে প্রেম করে তার সঙ্গে আমরা তার বিয়ে দিতে না চাইলে সে মেয়ে যেমন দরজায় খিল এঁটে বসে থাকে, তেমনই অবস্থা রাধারও। বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে যেমত যোগিনী পারা। এর মধ্যে মহাশক্তি কোথায় ?

কৃষ্ণ যখন গোকুল ছেড়ে মথুরায় যাচ্ছেন কংসকে বধ করতে। ব্রজবাসী কেঁদে আকুল। কৃষ্ণ যদি মনে করতেন রাধাই তার শক্তি তাহলে তো রাধাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। রাধাকে বলতেন—চল রাধা, তুমিই তো আমার শক্তি। তুমি না গেলে আমি কংসকে কি করে মারব। তুমিই তো আমার শক্তি, চলো। আমার রথে ওঠো। তারপর আবার ফিরে চলে আসবে। সে কথা কিন্তু কৃষ্ণের মুখে শোনা যায় নি। বরং অন্যান্যদের সঙ্গে রাধাও কেঁদেছেন। কৃষ্ণ মথুরা চলে যাবার পরবর্তীকালে রাধার নাম পর্যন্ত করেন নি। তাহলে কি করে বিশ্বাস করবো রাধা কৃষ্ণের শক্তি স্বরূপ। এ ন্যাকামো অন্ধভক্তিতে চলতে পারে, যুক্তিতে টেকে না। জ্ঞানেও না।

বৈষ্ণব দর্শনের তত্ত্ব অনুসারে ভগবানের তিনটি শক্তি। চিৎশক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি। এই চিৎশক্তির আনন্দ অংশের নাম হ্লাদিনী শক্তি। সেই শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ রাধার মধ্যে। বৈষ্ণবরা এও বিশ্বাস করেন যে শ্রীরাধা অথবা শ্রীমতী রাধারাণী মহাভোব স্বরূপিণী। রাধা কৃষ্ণগত প্রাণ। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই জানেন না। এই ধারার প্রেমের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের বিকাশ হয়। আমি জানি এসব তত্ত্বকথা সাধারণ মাথায় ঢোকার কথা নয়। লৌকিক দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষ হিসাবে আমরা যা দেখি তা হলো—রাধা একজন সুন্দরী মহিলা। পরস্ত্রী। শ্রীকৃষ্ণ তার কাছে পরপুরুষ। সামাজিক শাসন অস্বীকার করে, আত্মীয় স্বজনের লাঞ্ছনা গঞ্জনা উপেক্ষা করে রাধা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। বৈষ্ণবরা এর মধ্যেই পরমপুরুষের সঙ্গে মিলনের আকুলতা দেখেন। এখন প্রশ্ন হলো এই সব তত্ত্ব ও তথ্যকে স্বীকার করে নিয়ে যদি দেখি আমার আপনার ঘরের বউ যদি রাধার মতো রাতের আঁধারে ঘর ছেড়ে পরপুরুষের কাছে যায় এবং তারপর আপনি কোন প্রশ্ন করলে সেও যদি ধারার মত বলে—"কুলমরিয়াদ-কপাট উদ্ঘাটলু তাহে কি কাঠ কি বাধা। " তাহলে কি আমাদের খুব ভালো লাগবে। সমাজ সংসার তাতে কি রক্ষা পাবে। বস্তুত বৈষ্ণবদের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়েই বলছি—সব বাড়ির বউরা যদি রাধা হয় তাহলে সমাজ-সংসারে কোন্ উপকার সাধিত হবে? এমন পরকীয়া দিয়ে আমরা সামাজিক উন্নতিসাধন করতে পারবো? একগাদা গোপী কৃষ্ণকে ঘিরে নাচছেন তা দেখতে বা শুনতে ভালো লাগতেই পারে। কিন্তু জগতের কোন উপকার সাধিত হবে না। আধ্যাত্মিক চেতনা একান্তই নিজস্ব ব্যাপার। সমাজ চেতনাকে

এভাবে গুলিয়ে ফেলা কেন ? ভারতের শক্তিস্বরূপা দেবীদের আরাধনা করি। দুর্গা আছে, কালী আছে, লক্ষ্মী, সরস্বতীও আছে। চণ্ডী জগদ্ধাত্রী সবই আছে। সেই শক্তির দেবীদের তালিকাতেও রাধা নেই। যদি আমরা বুঝতাম রাধা শক্তির আধার। তাকে ছাড়া আমাদের গতি নেই, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা এতদিন রাধা পূজায় মেতে উঠতাম।

ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য মাতৃত্ব। প্রতিটি নারীর পূর্ণতা মাতৃত্বে। সেই মনুষ্য চরিত্রই হোক বা দেবী চরিত্র। মা দুর্গা, মা কালী, মা লক্ষ্মী, মা সরস্বতী এসব সাবেকী মায়েরা তো আছেন। এমন নয় যে আমরা সবার ছেলেপুলের নামও জানি তবুও দেবী হিসাবে আমরা মায়ের আসনেই বসিয়েছি। রাধার সে যোগ্যতাও নেই। শুনেছেন কেউ কখনও বলেছেন 'মা রাধা'। মালা টিকি শোভিত বৈষ্ণবগণ এনিয়ে নানা তত্ত্ব কথা বলেন। এর কিছু কারণও দেখান। কিন্তু এসব ছেঁদো যুক্তি। ধোপে টেকে না। মায়ের দেশ ভারতেই রাধার মাতৃত্বে উত্তরণ ঘটেনি। তার পরেও রাধা প্রেম কান্তা প্রেম, পরকীয়া প্রেম এসব নিয়ে আমাদের কি মাতামাতি। কৃষ্ণ আদর্শ ভুলে গিয়ে সমাজকে সংগঠিত না করে শুধু রাধা। প্রেম নিয়ে মেতে থেকে যা হবার তাই হচ্ছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে আছে নগর বসালাম-সাগর বাঁধিলাম-মানিক পাবার আশে-সাগর শুকাল মানিক লুকাল অভাগী করম দোষে। রাধা নিজেও জানতেন তিনি অভাগী।

এখন দেশের বৈষ্ণবদের দোষে কৃষ্ণের অবস্থা বেহাল। কিছুদিন আগে একটি আশ্রমে মচ্ছব চলছিল। অন্যান্য আরও আশ্রমে যে সব ছবি দেখা যায়। এখানেও তাই। আশ্রমের বাইরে ক্ষুধার্ত একদল কুকুরের সঙ্গে ভিখারীদের মারামারি। এক যুবক ছেলেকে ডেকে বললাম, ভাই কুকুরগুলোকে একটু তাড়িয়ে দেবে। আমার কথা বোধহয় মহারাজ শুনতে পেলেন। মহারাজ বলেন, না না, ছি ছি, আমরা অহিংসার পূজারী। আমার আশ্রমে কুকুর মারা যাবে না বাবা। ওরাও তো প্রাণী। বললাম কিন্তু ছেলেমেয়ে গুলোকে কামড়ে দেবে সে। বললেন, বাবা সবই তো কৃষ্ণের লীলা। ওসব শুনে আর মাথার ঠিক ছিল না। বললাম, মহারাজ কিছু মনে করবেন না, আপনার কি মনে হয়। কৃষ্ণের জীবন অহিংস ছিল। কৃষ্ণের জীবনের কোন অংশই তো অহিংস নয়। সেখানে তো সমাজ ও যুগের প্রয়োজনে হিসাংই হিংসা। একের পর এক হত্যা। শুধু হত্যা নয়। কুরুক্ষেত্রের মাঠে দাঁড়িয়ে তো রীতিমত হিংসার প্ররোচনা। হত্যা করতে, যুদ্ধ করতে প্ররোচনা। এমনকি তিনি আবার যদি আসেন সেতো দুষ্কৃতিদের বিনাশ করতে আসবেন। বাবাজী চুপ করে গেলেন। ক্রুদ্ধ হলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। বললেন, চলুন ওঠা যাক।

বৈষ্ণবদের বাবাজীদের এই মৃত্যুসাধনা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। আমাদের খিচুড়ি খাওয়া যখন শেষের দিকে তখন কানে এলো মাইকে গান — "মরিব মরিব সখী নিশ্চয়ই মরিব"। বাবাজীকে বললাম— শুনছেন। এভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাজীবন যদি কেবল 'মরিব মরিব' করেন—যদি জোর দিয়ে বলেন, নিশ্চয়ই মরিব। তাহলে আপনাদের বাঁচাবে সাধ্যকার। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও ক্ষমতা নেই এইসব ভণ্ড কৃষ্ণভক্তদের বাঁচাবার। গীতার শেষে আছে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ সেখানেই বিজয়। এতো দেখছি উল্টো। পরমপুরুষ তেজস্বী, বীর, শ্রীকৃষ্ণের নামে মৃত্যুসাধনা। কৃষ্ণ সারাজীবন শেখালেন জীবনের সাধনা। আমরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে মেতে গেলাম মৃত্যুসাধনায়।

কৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে নানা কথা বলেছেন। তত্ত্বকথা, গুহ্যকথা। সবশেষে বলেছেন— সবই তো শুনলে এবার—"যথেচ্ছসি তথা কুরু"। অর্থাৎ যেটা ভালো বোঝো তাই কর। আমাদের বোঝা উচিত ছিল—এই হলো যুগের উপযোগী কথাবার্তা। যুগ ও সমাজ কি চাইছে তা বিচার করা। যুক্তিবাদী হও। চারপাশটা ভালো করে দেখ। তারপর তোমার যা ভাল মনে হয় তা কর। এর চেয়ে সহজ যুক্তিগ্রাহ্য বুদ্ধিগ্রাহ্য আর কি হতে পারে।

যদি আমরা প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত হতাম তাহলে চারপাশটা দেখে নিতাম। কৃষ্ণ যেমন শত্রু-মিত্র চিনতেন,

তেমনই আমরা কে শত্রু আর কে মিত্র তা জেনে নিতাম। যখন যেমন তখন তেমন প্রয়োজন বুঝে কাজ করতাম। পাঁচশো বছর আগে কে কি বলে গেছে তা নিয়ে নিশ্চয় মেতে থাকতাম না। কবেকার কোন এক রাধা যে আবার চোখে কাজল পরে চিত্ত হরণে দক্ষ তাকে এখন না হলেও চলবে। হিন্দুসমাজ যদি না থাকে, তাহলে টিকিধারী, মালাধারী, চৈতনধারী রসকলিধারী কোন বৈষ্ণবই থাকবে না। এক রাধা বৈষ্ণবী সেজে তখন আর বসে থাকার জায়গা পাবে না। কোন বৈষ্ণব পদকর্তাও আর লিখতে পারবেন না — "এমন পিরিতে কভু-দেখিনাই শুনি—পরাণে পরাণ বান্ধা আপনাআপনি। " দ্বিজ চণ্ডীদাসের একটি পদে আছে — "পিরীতি নগরে বসতি করিব-পিরিতে বান্ধিব ঘর—পিরিতি দেখিয়া পড়শি করিব, তা বিনে সকলি পর। " প্রত্যেক বৈষ্ণবের এটুকু অন্ততঃ মনে রাখা উচিত যে পিরিতি নগরে বসতি স্থাপন করতে গেলে হিন্দুসমাজ দরকার। পিরীতি পালঙ্কে শোয়া তো অনেক দূরের ব্যাপার। এখন ভারতের কোন পুরোপুরি সিদ্ধ বাবাজীও ভাবেন না যে পাকিস্তান বা বাংলাদেশে পিরিতি নগর গড়ে উঠবে। গান্ধারীর দেশ গান্ধারের তালিবান অঞ্চলে যদি রাধা যান তাহলে তার কি হাল হবে কেউ কি ভেবে দেখেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাস্তববাদী ছিলেন। তাকে নিয়ে একালের বৈষ্ণবদের যে ন্যাকামো তা ছিল না কোথাও। আমরা যদি ভণ্ড কৃষ্ণভক্ত না হই তাহলে আমরা অন্ততঃ এটুকু শপথ নিতে পারি যে-ভাগে আমরা ভারতের যেটুকু অংশ পেয়েছি সেটুকুকেই আমরা বৃন্দাবন বানাবো। কৃষ্ণের দেশে এত আতঙ্ক-এত সন্ত্রাসবাদী কেন। এটাকে আমরা নিধুবন বানাবো। কৃষ্ণের নামে সেটুকু সৎসাহস কি আমরা দেখাতে পারি।

ভারতবর্ষে এখন প্রেম প্রচারের এমন আশ্রম আখড়া মঠের সংখ্যা লক্ষাধিক। প্রতিনিয়ত নাম সংকীর্তন হয়। গোকুলদানা নকুলদানা মণ্ডা মিঠাইয়ের ভোগও হয়। বাবাজী মাজী গোঁসাইজী আছে কয়েক লক্ষ। এদের অনেকেই নিয়মিত কৃষ্ণভজনা করেন। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যযাবে, এঁদের জীবনের আদর্শের সঙ্গে কৃষ্ণের জীবনের কোনও মিল নেই। কৃষ্ণের সারাজীবন কেটেছে ত্যাগে যুদ্ধে আর দুষ্কৃতি দমনে। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, কূটনীতি সবেতেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তৎকালীন সমাজে কৃষ্ণের ত্যাগ বিরাট। সেটাই আমাদের আদর্শ। নিরন্তর যোগ, নিরন্তর ত্যাগ। সমাজ গঠনের নিরন্তর প্রচেষ্টা। অথচ লক্ষ লক্ষ বাবাজী গোঁসাই কৃষ্ণপ্রেমে পাগল মানুষের জীবন ঠিক এর বিপরীত। বেশিরভাগ বাবাজী সকালে উঠে করেন মলত্যাগ আর সারাদিনে কয়েকবার মূত্রত্যাগ। এছাড়া বেশিরভাগ কৃষ্ণভক্তের আর কোনও ত্যাগ নেই। পাড়ায় পাড়ায় কোন ঝামেলা হোক সেই পাড়ায় যদি কোন আশ্রম থাকে বাবাজীরা বেরোবেন না। জিজ্ঞাসা করুন বলবে—আমরা কৃষ্ণের ভক্ত। ঠাকুর নিয়ে থাকি। ওসব ঝামেলায় যাই না। সাতে পাঁচে থাকি না। অথচ কৃষ্ণের সারাজীবন কেটেছে এই ঝামেলা সামলাতে সামলাতে। কোথাও হুমকি দিয়ে। কোথাও বধ করে। সমাজের স্বার্থে এটাই তো দরকার। আমরা কিন্তু ঠিক বিপরীত। এটা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। যখন দেশের জন্য সমাজের জন্য কিছু করতে হয় ঠিক তখনই উথলে ওঠে ভক্তি। সঙ্গে সুন্দরী মেয়ে নিয়ে গেলে বাড়তি কিছু সুযোগ সুবিধাও পাওয়া যায়। গত ২৫ বছর ধরে এমন অসংখ্য বাবাজীর সান্নিধ্যে এসেছি। বেশিরভাগই দেখেছি গেরুয়া বসনের আড়ালে এক একটি ভেড়ুয়া লুকিয়ে আছে। সময় সুযোগ পেলেই বেড়িয়ে পড়ে। এদের বেশির ভাগ পরান্নভোজী। ভক্তরা না দিলে খেতে পাবে না। অনেক ভক্তকে দেখেছি খুব গর্বের সঙ্গে বলেন—আমাদের গুরুদেব তো নিরামিষ খান। সকালে দামী চালের ভাত। পোওয়াটেক গাওয়া ঘি পনির এমন সব। সারাদিন ফলের রস। রাতে ঘিয়ে ভাজা লুচি গোটা আষ্টেক সন্দেশ। খাদ্যতালিকায় চোখ রাখলে বোঝা যাবে এরা যোগী নয় ভোগী। অনেক বাড়িতে দেখেছি খাবারের ব্যাপক আয়োজন হচ্ছে হঠাৎ, ভক্ত মানুষ। জিজ্ঞাসা করলাম কি ব্যাপার এত আয়োজন কেন। সেই বাড়ির কাকিমা গদ গদ হয়ে বললেন, জানেন তো অনেকদিন পর গোঁসাই ঠাকুর আসছেন বাড়িতে। এ চিত্র সর্বত্র। নতুন জামাই আসছে না কোন বাবাজী আসছে বুঝতে কষ্ট হয়।

কৃষ্ণ আশ্রিত এইসব আশ্রমের কাজকর্ম স্পষ্ট নয়। শুধু মাঝে মাঝে ভক্তরা আসেন। তবে অনেক

বিখ্যাত আশ্রম সম্পর্কে যে প্রচার তা আর যাই হোক অন্তত কৃষ্ণের আদর্শ প্রচার করে না। পশ্চিমবঙ্গে এমনই একটি বিখ্যাত আশ্রম আছে। দেশী বিদেশি ভক্তরা ২৪ ঘণ্টা নামসংকীর্তন করেন। প্রতিদিন বহু মানুষ যান। যে কোনও সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসা করুন অমুক আশ্রমে গেছেন কোনদিন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর—যাইনি, আবার, ওই আশ্রমের ভোগটা যা খেতে ৫০ টাকায় ওইরকম খাবার। আমার দারুণ লেগেছে। ব্যাপারটা বুঝুন। আশ্রম ঘুরে এসে রেস্তোরাঁর বিজ্ঞাপন। গোটা আশ্রমে ঘুরে হরিনাম শুনে মনে দাগ কাটল কেবল রেস্তোরাঁর খাবার। বাইরে প্রচার হলো অমুক আশ্রমে ভালো খাবার পাওয়া যায়। একেবারে হোটেলের বিজ্ঞাপন। কৃষ্ণের আদর্শের কোন গল্প নেই। সমাজসেবার কোন গল্প নেই। ভোগী হলে এমনই হয়।

পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গার ধারে আরেকটি কৃষ্ণভক্তির আশ্রম আছে। আশ্রমের বৈশিষ্ট্য অখণ্ড হরিনাম। বছর দশেক আগে গিয়েছিলাম। তখন দেখেছিলাম সাজানো আশ্রম প্রচুর গাছপালা। মাঝে কৃষ্ণ মন্দিরে বসে দুটি লোক নাম করছে। আশ্রমের প্রধান মহন্ত তখন শয়নে। বেশ দামী খাট। সেই আশ্রমে এবছর গিয়েছিলাম। এখনও দুটি লোক বসে হরিনাম করছে। প্রধান মোহন্ত দেহ রেখেছেন। আশ্রমের বেশিরভাগ গাছ চুরি গেছে। হরিনাম চলছে। হতশ্রী অবস্থা। এখন যদি আপনি প্রশ্ন করেন। ১০ বছর ধরে অখণ্ড হরিনাম করে কার কি লাভ হলো। সমাজেরই বা কি হলো। আশ্রমেরই বা কি হলো। অমনই ভক্ত বলবে সবই লীলা। প্রভু যা চেয়েছেন। সেই একই কথা চুলকানি।

এই সব পরান্নভোজী পরমাভোগী কৃষ্ণভক্তদের বেশিরভাগের দিন কাটে বাঁজা তর্ক করে। ছোটবেলায় যখন সংস্কৃত নিয়ে চর্চা করতাম তখন একবার একটি টোলে পণ্ডিতদের মধ্যে তর্কাতর্কি দেখেছিলাম। বিষয়ছিল শিবের ভুঁড়ি। শিবের ধ্যানে বলা আছে তাঁর ভুঁড়ি উর্বারুকের মতো। উর্বারুক মানে লাউ বা কুমড়ো। একদিন সারাদিন লাগিয়ে দিলেন শিবের ভুঁড়ি লাউয়ের মতো নাকি পাকা কুমড়োর মতো তা নির্ণয় করতে। কৃষ্ণভক্তদের আলোচনা আরও গুরুগম্ভীর। মূলোর মতো টিকি না গাজরের মতো টিকি এই নিয়ে। রসকলি লম্বা হবে না চওড়া হবে। চন্দনের ছোপ শরীরের কোথায় কোথায় থাকবে এসব নিয়ে হাজার তর্ক। লম্বা টিকি হলে কবার গিঁট দিতে হবে তা নিয়েও তর্ক করতে শুনেছি। ভণ্ড আর কুঁড়ে মানুষদের যা লক্ষণ থাকা দরকার তা সবই আছে। এরা সব কৃষ্ণ ভক্ত। অথচ কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না। জীবনে বিন্দুমাত্র অন্যায় সহ্য করেন নি শ্রীকৃষ্ণ। মাঝে মাঝে এত রেগে গেছেন যে প্রতিজ্ঞার কথা ভুলেই গেছেন। যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্মকে মারার সময় অর্জুন পারছেন না। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ছুটে গেলেন ভীষ্মকে মারতে। রাগে গর গর করতে করতে। শিশুপাল কৃষ্ণনিন্দা করছিলেন সভামধ্যে। চক্র দিয়ে মাথাটাই কেটে দিলেন। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য প্রভৃতির সামনে বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন। বিশ্বরূপ দেখানো মানে কি, ভক্তরা বলেন ঠাকুরের কি মাহাত্ম্য। আসলে যে কোন শত্রুকে বশে রাখতে গেলে মাঝে মাঝে ক্ষমতার জাহির করতে হয়। জানাতে হয় যে আমিও শক্তিশালী। আমাকে দুর্বল ভেবো না। এতে শত্রুরা আক্রমণে ভয় পায়। কৃষ্ণ ঠিক তাই করেছেন। মাঝে মাঝে নিজের ক্ষমতা দেখিয়েছেন। আর এইসব কৃষ্ণভক্ত বাবাজীরা কি করেন। আশ্রমের গেটের সামনে কোন মেয়ে ধর্ষিতা হোক বাবাজী জানালা দিয়ে জুলজুল করে দেখবেন। প্রতিবাদ করবে না। পুলিশ এলে বলবে আমি তো কিছু দেখিনি। তারপরই আপনি গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন বাবাজী পুলিশকে কিছু বলবেন না কেন। আমনি উত্তর কি দরকার ঝামেলার। সবইতো ঈশ্বরের লীলা। কি অবস্থা, ধর্ষণকে আমরা ঈশ্বরের লীলা বলে চালিয়ে দিই। এ ভণ্ডামি সর্বত্র চলছে। তাই লক্ষ লক্ষ বাবাজী গুরুজী গোঁসাই দিয়ে একটা দেশ সুন্দর করে তোলা যাচ্ছে না। অথচ শুধু এদেশের কৃষ্ণ ভক্তরা যদি একটু সৎ হতো সমাজ সচেতন হতো ভোগী না হয়ে যোগী হতো তাহলেই দেশটা অন্য রকম হতো। দুহাত তুলে রাধে রাধে করে যে সমাজ তাতে দেশ রক্ষা হয় না তার প্রমাণ অজস্র। এখনতো অবস্থা এমন যে কৃষ্ণভক্ত দেখলেই লোক ভাবে হয় চোর না হয় ধান্দাবাজ। এ নিয়ে প্রচুর রসালো গল্পও আছে। সে প্রসঙ্গ অন্য কোথা অন্য কোনখানে।

বেশিরভাগ কৃষ্ণভক্তের ধারণা পৃথিবীর সব সমস্যার সমাধান হলো কৃষ্ণনাম। বিশ্বের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বিভিন্ন সভায় বড় বড় বক্তাও এই নিদান দেন। আমাদের পাশের গ্রামে হালিমচাচা পাচন সেদ্ধ বিক্রি করত। পাচনসেদ্ধ মানে আম জাম তেঁতুল থেকে শুরু করে দুনিয়ার গাছপালা একসঙ্গে সেদ্ধ। সকাল থেকে প্রচুর রোগী। পেটে ব্যথা চুলওঠা আমাশয় এই ওষুধ। সবেতেই ওই এক অব্যর্থ ওষুধ পাচন সেদ্ধ। কৃষ্ণভক্তদের ভাষায় হরিনাম যেন সেই পাচন সেদ্ধ। যেকোন বিপদের পরিত্রাণ। অবাস্তব বুদ্ধি আর অযৌক্তিক মন হলে এমনই হয়। ভক্তেরা এমন দুর্বলতার আশ্রয় নেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ আর সমাজ গঠনের চেয়ে দুহাত তুলে হাউ হাউ করে কাঁদা অনেক বেশি সহজ। আর এভাবে কাঁদতে কাঁদতে কান্নাটাকেই আমরা নিয়তি বলে ধরে নিয়েছি।

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে হরিনামের নিশ্চয় একটা ভূমিকা আছে। উচ্চস্তরের ব্যাপার। সঙ্গীতমধুর্যের ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব আছে। তাও অস্বীকার করি না। নামসংকীর্তনকে কেন্দ্র করে মানুষ সমবেত হন। তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ বা বন্দেমাতরম যেমন বিপ্লবীদের মনে কেটা অনুরণন তুলতো তেমনই হরিনাম কিছু মানুষকে মাতিয়ে রাখে। মানুষকে সংঘবদ্ধ করার শক্তিও হরিনামের মধ্যে আছে। এও সত্য। তা মানি। কিন্তু হরিনাম দিয়ে সবকিছু হয় এই মিথ্যা কেন। হরিনাম আধ্যাত্মিক ব্যাপার। তা দিয়ে বাস্তব সমস্যার সমাধান হয় না, কঠিন সত্য কথা। অপ্রিয় সত্যও বলতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ কখনও বিপদের সময় কাউকে বলেনি হরিনাম কর। কংসকে না মেরে বলতে পারতেন হে কংস যাও মথুরার শেষ প্রান্তে গিয়ে একটা আশ্রম কর আর হরিনাম কর। বছরে একবার করে মোচ্ছব দেবে। দেখবে খিচুড়িটা যেন ভালো হয়। সঙ্গে বাঁধাকপির তরকারি আর চাটনি দিও। শিশুপালের মুখে নিজের নিন্দা শুনে বৈষ্ণবদের মতো মেয়েলি নরম গলায় বলেননি—ছি শিশুপাল ওসব বলে না। ঠিক আছে তোমার ঘরে হরিনামের দল পাঠিয়ে দিচ্ছি। শ্রবণে পুণ্য। তোমার মন ভালোবাসায় পূর্ণ হবে। কুরুক্ষেত্রের মাঠ। অর্জুন যুদ্ধ করবে না। রাজ্যভোগের ইচ্ছা নেই। কৃষ্ণ বলেননি—বাঃ অর্জুন, এই তো তোমার প্রকৃত বৈরাগ্য। দাঁড়াও দারুককে বলে হস্তিনাপুর থেকে গেরুয়া পোশাক, একজোড়া খঞ্জনি আর কেজিখানেক এলা মাটি আনিয়ে দিচ্ছি। সঙ্গে জপের মালাও দেব। তুমি যমুনার তীরে তমালতলায় বসে হরিনাম করো। যুদ্ধের আগে পরামর্শ হচ্ছিল যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে। যুধিষ্ঠির কিন্তু কিন্তু করছিলেন। বলছিলেন কি হবে যুদ্ধ করে। এসব দেখে তো কৃষ্ণের বলা উচিত ছিল—ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির এবার একটা কাজ করো। তোমরা পাঁচভাই, দ্রৌপদী, ছোটছেলে পুলে সবাইকে নিয়ে কুরুক্ষেত্রের মাঠে যাও। সঙ্গে নেবে ১০০ খোল, ২০০ মৃদঙ্গ আর ৩০০ খঞ্জনি। তারপর ২৪ প্রহর হরিনাম সংকীর্তন করবে। সাবধান দেখ যেন বাজনা বন্ধ না হয়। যেন অখণ্ড হয়। তাহলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয় নিশ্চিত। কৃষ্ণ বলেননি। বললেন, রাজার মতো কথা বলো। রাজ্য রক্ষা করা তোমার ধর্ম। আরও আছে। অর্জুনের ছেলে অভিমন্যু মারা গেছে। ভীমের ছেলে ঘটোৎকচ মারা গেছে, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র মারা গেছে। সবাই শোকে পাথর। কৃষ্ণ এলেন। নামকা ওয়াস্তে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর বললেন চলো অর্জুন যুদ্ধ করো। একবারও বললেন না ছেলে মারা গেছে রাতে সংকীর্তন করাও। আর কৃষ্ণভক্তদের বাসমতী চালের মোচ্ছবি দাও। কৃষ্ণের ছেলে শাম্ব অত্যন্ত বদ ও ফাজিল। বাবা সর্বশক্তিমান আর ছেলে বখাটে। মুনি ঋষিদের সঙ্গে ফাজলামো করতে গিয়ে নিজের বাবা সহ সারা বংশের ধ্বংস ও মৃত্যু ডেকে এনেছিল। কৃষ্ণ জানতেন। একবারো বলেননি—শাম্ব মুনিঋষিদের সঙ্গে ফাজলামো করা তোমার উচিত হয়নি। তুমি তিনদিন তোমার বন্ধুদের নিয়ে অখণ্ড হরিনাম করো। তাহলেই আমাদের বংশ রক্ষা পাবে। আসলে কৃষ্ণ বাস্তব আর কল্পনার মধ্যে ফারাকটা বুঝতেন। কৃষ্ণভক্তরা বোঝেন না। কৃষ্ণ বাস্তববাদী ও যুক্তিবাদী। কৃষ্ণভক্তরা অবাস্তববাদী আর যুক্তিহীন সঙ্গে মিথ্যাবাদী। এসবেও ভক্তরা সেই কথাই বলবেন সবই লীলা। সেই একই চুলকানি। মোষের ঘাড়ে দাদ।

আধুনিক যুগেও বাস্তব কোন সমস্যার সমাধান হরিনামে হয়নি। এখনও পর্যন্ত হরিনাম দিয়ে কোনও দুষ্কৃতির বিনাশ সম্ভব হয়নি। হাজার বছরের বেশি ধরে বারে বারে আক্রান্ত হচ্ছে আমাদের

দেশ-আমাদেরসমাজ-আমাদের নারী। হাজার হরিনাম দিয়েও আমরা তা রক্ষা করতে পারিনি। মধ্যযুগে খাস বৃন্দাবনে ৫০ হাজার টিকিধারী বৈষ্ণবকে কচুকাটা করেছিল দুস্কৃতিরা এদের কারও সঠিক টিকি রসকলি বা নামাবলী ছিল না অথবা ঠিকঠাক হরিনাম করেনি তা তো নয়। সবই ছিল, ভক্তিও ছিল, শুধু শক্তি ছিল না। আর বাস্তব বুদ্ধি ছিল না। এখন এই পোড়া ভারতেই সব জায়গায় হরিনামের দল যেতে পারেনা। সরকারের আগাম অনুমতির দরকার। হরিনাম দিয়ে আমরা নিজেদের মতো একটুও জায়গা তৈরি করতে পারিনি। বাংলাদেশ থেকে শুধু প্রাণটুকু নিয়ে পালিয়ে এসেছে প্রচুর মানুষ যাদের আমরা বাঙাল বলি। এদের কৃষ্ণ প্রেমের ঘটা একটু বেশি। বেধড়ক ঠ্যাঙানি খেয়ে ভিটে মাটি ছেড়ে পালিয়ে এসেও মা বোনের ইজ্জত হারিয়েও এদের চেতনা হয় না। বাংলাদেশে এরা হরিনাম করত না, একথা কেউ বলে না। যে কোন বাঙালি দাদুর গল্প শুনলেই শোনা যায়—ওখানে যা নামকীর্তন হতো, ২৫ হাজার লোকের মচ্ছব। বাস্তব হচ্ছে তার পরেই প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে। হরিনাম আর মোচ্ছব দিয়ে ভিটেমাটি রাখা যায় না। এদেশের বহু মহাত্মা বহু অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন গুরুর বাড়ি ছিল বাংলাদেশে। সবাই সময় থাকতে পালিয়ে এসেছে। এদের অলৌকিক বুদ্ধি বলেছে হরিনামই সব, নাম করো গুরুর নাম করো। আর এদের লৌকিক বুদ্ধি বলেছে প্রাণে বাঁচবিতো এখান থেকে পালা। ওসব দিয়ে কিস্যু হবে না। এটাই বাস্তব। হরিনাম দিয়ে কঠিন কঠোর বাস্তবের সঙ্গে লড়াই হয় না। কল্পনা হেরে গো হারা হয়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। গত হাজার বছর ধরে বার বার আক্রান্ত হয়েছে ভারতবর্ষ। কৃষ্ণনাম আর হরিনাম দিয়ে আমরা বাঁচাতে পারিনি।

নামকীর্তনে সব হয় বলে প্রচার করেন তাদের অন্তত এটুকু ভাবা উচিত— নামগান দিয়ে আমরা বাংলাদেশে, পাকিস্তানে মা বোনের ইজ্জত কৃষ্ণের মন্দির ভগবান কোনটাই বাঁচাতে পারিনি। ভারত থেকে সন্ত্রাস দূর করতে পারিনি, দেশরক্ষা করতে পারিনি। কিছু পারিনি। আমি জানি এক্ষেত্রে বৈষ্ণব ভক্তরা কি বলবেন, তারা বলবেন—ডাকার মতো করে ডাকতে হবে, এ হলো আরেক মিথ্যা। বৃন্দাবনে যে ৫০ হাজার বৈষ্ণবকে কচু কাটা করা হয়েছিল তাদের মধ্যে একজনও ডাকার মতো করে ডাকতেন না এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা মহাগুরু ব্রহ্মচারী, পরমপুরুষ এরা কেউ ডাকার মতো ডাকেন না সেটাও কি বিশ্বাস করা যায়। তা ছাড়া ওষুধ যদি সত্যিই ভালো হয় তাহলে জেনে খেলেও কাজ হবে অজান্তে খেলেও কাজ হবে। নেহাত অনিচ্ছাতেও যদি আপনি বিষ খান তাহলেও আপনার মৃত্যু হবে। সুতরাং ডাকার মতো ডাকা এ ভণ্ডামির দরকার কোথায়।

নামকীর্তন আর সকাল সন্ধে অহরহ হরিনাম প্রসঙ্গে গুরু মহাগুরু পরমপুরুষ বাবাজী মাজীদের অন্যতম যুক্তি-নাম আর নামী অভেদ। এই দুই এ কোন ভেদ নেই। নাম করলেই নামীকে পাওয়া যায়। শত শত বছর ধরে আমরা এই চরম মিথ্যাটাকে বিশ্বাস করে আসছি। এই অযৌক্তিক বিষয়টি নিয়ে আমাদের দিন কেটে যায়। ধরুন কেউ ডাক্তার হতে চায়। এখন যদি সে প্রতিদিন এক হাজার বার ডাক্তার ডাক্তার বলে জপ করে আর পড়াশুনা না করে তাহলে কি সে ডাক্তার হবে। রবীন্দ্রনাথের নাম জপ করলেও কেউ পণ্ডিত হবে না। ঐশ্বর্য মাধুরীর নাম জপ করলেও কেউ সুন্দরী হবে না। এগুলো সত্য। সারাদিন টাকা টাকা করলে যদি টাকা পাওয়া যেত তাহলে আমরা এত পরিশ্রম করতাম না, সহজে বড়লোক হয়ে যেতাম। সবকিছুরই কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে ফর্মুলা আছে। সাধন ভজন কীর্তনেরও ফর্মুলা আছে। অহেতুক বিকট চিৎকার করলে হয় না। যে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গুরুবাবাদের বার্ষিক মোচ্ছবের সম্মেলনে কয়েক হাজার ভক্ত রাস্তা দাপিয়ে গলা কাঁপিয়ে হরিনাম করেন। এদের মধ্যে কতজন স্বচ্ছ চরিত্রের। কতজন তার ছেলের বিয়েতে পণ নেন না ছেলের চাকরির জন্য ঘুষ দেন না। খুঁজতে গেলে সঙ্ঘগুলি ভক্ত শূন্য হয়ে যাবে।

কয়েকমাস আগে এক আশ্রমের প্রধান পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণভক্ত এসেছিলেন। আশ্রমে বিরাট মোচ্ছব। অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তন। এসেছিলেন চাঁদার জন্য। একথা সেকথার পর বললাম। আপনারা কৃষ্ণ হরিনাম মোচ্ছব এসব নিয়ে আছেন খুব ভালো কথা। ভারতবর্ষের মূল হলো আধ্যাত্মিকতা। আপনারা তা রক্ষা

করছেন তাও ভালো। কিন্তু কৃষ্ণের বীরত্বের কথা গীতার কথা যুদ্ধের কথা পৌরুষের কথা ভক্তদের বলেন না কেন? বাবাজী বলেন—দেখ বাবা কৃষ্ণই যে গীতার কথাগুলো বলেছিলেন তার তো কোন মানে নেই। ওগুলো সব কল্পনা করে লেখা। বেদব্যাসের। আমি বললাম আপনাদের বৃন্দাবন লীলা সেও তো কল্পনা। বললেন হ্যাঁ হতে পারে। দুটোই কল্পনা। সবই ভাব সবই আবেগ, যার যেমন ভাব সে তেমন গ্রহণ করে। আমি বললাম। কিন্তু কল্পনা দিয়েও তো উপকার হয়। যেমন ধরুন, একদিন আপনি কল্পনা করলেন সন্ধেবেলায় আকণ্ঠ মদ খেয়ে আপনি মেয়েদের হাত ধরে টানছেন ধরা পড়লেন, আপনাকে বেধড়ক ঠ্যাঙানি দিয়ে গোটা গায়ে গু মাখিয়ে ড্রেনে ফেলে দিল। আর একদিন আপনি কল্পনা করলেন আপনাকে বীরত্বের জন্য নোবেল প্রাইজ দেওয়া হচ্ছে। বিরাট আলোকিত মঞ্চ। মাঝখানে আপনি দাঁড়িয়ে। সারা পৃথিবী আপনাকে দেখছে। গোটা পৃথিবী আপনাকে বাহবা দিচ্ছে। তাহলে কোন কল্পনা আপনার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য। বাবাজী আর কিছু বলেননি, সেদিন চাঁদা নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। এখন মাঝে মাঝেই আসেন, এখন আর আশ্রমে রাধাকৃষ্ণ নয়, সুদর্শনধারী রাষ্ট্রপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয়। ভক্ত কমেছে। কিন্তু যুবকদের ভিড় বেড়েছে। বাবাজী নিজেই বলেছেন। এই পরিবর্তনটাই এখন একমাত্র কাম্য। দীর্ঘদিনের অভ্যাস ছাড়তে সময় লাগবে। নানা যুক্তি তর্ক হবে। কল্পনাকে বিসর্জন দিয়ে বাস্তবকে মেনে নিতে কষ্ট হবে। কৃষ্ণের সারাজীবন কষ্টেই কেটেছিল, নিজের বংশ পর্যন্ত ছিল না। সুতরাং কৃষ্ণের ভক্তদেরও সেই কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

লীলা কীর্তন বা পালাকীর্তন এখন অত্যন্ত জনপ্রিয়। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে ও সঙ্গীতে একটা জায়গা করে আছে এই কীর্ত্তন গান। সঙ্গীত হিসাবে অতুলনীয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। খোল করতাল সহযোগে তা শ্রুতিমধুর। এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিষয় নির্বাচনও তার বর্ণনা। কৃষ্ণের কোন রূপকে আমরা তুলে ধরেছি কীর্তনের মধ্য দিয়ে। নৌকাবিলাস, খণ্ডিতা, বাসকসজ্জা, রাসমিলন এইসব পালাকীর্তনের মূল যে বিষয় সেখানে কৃষ্ণের চরিত্র কি খুব উজ্জ্বল ? কীর্তনের সংজ্ঞা 'নামলীলাগুণাদীনাং উচ্চৈভাষা তু কীর্তনম''। উচ্চস্বরে লীলা আর গুণের বর্ণনা। কৃষ্ণের গুণ আর লীলা কি শুধু রাধার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাহলে কংসবধ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ এসব কীর্তন হয় না কেন? বীরত্ব পৌরুষ,দৃঢ় মানসিকতা এগুলো কী কোন গুণই নয়। বৈষ্ণব পদাবলীর মূল আকর জয়দেবের গীতগোবিন্দ বিশ্বের অতুলনীয় সাহিত্য। ভাষায়, ভাবে ব্যঞ্জনায়, বাক্য সাজানোতে। কিন্তু রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে যে বর্ণনা তাকে ভক্ত ভগবানের বর্ণনা অথবা এর মধ্যে সূক্ষ্মতত্ত্ব আছে বলে যতই ন্যাকামো করা হোক তা বিশ্বাসযোগ্য হবে কি। অন্ধকারে নিকুঞ্জে রমণ অথবা রাধার শরীরী বর্ণনা তাতে কি ভগবান খুব জ্যোতিযুক্ত হন। নিকুঞ্জে দুজনের বেডসিনের যে বর্ণনা তা কীর্তনের মধ্য দিয়ে যত গাওয়া হোক তা থেকে একধরনের যৌন সুড়সুড়ি পাওয়া যেতে পারে, ভক্তি কখনই নয়। রাধার সুন্দর শরীর নিয়ে খেলা করছেন কৃষ্ণ একথা বলার পর তার মধ্যে যতই সূক্ষ্মতত্ত্বের অবতারণা করা হোক ভক্ত ভগবানের লীলা বলে যতই ফুলঝুরি ছোটানো হোক তা প্রভাব ফেলে না। তাই রাতের পর রাত কীর্তন হলেও তার কোন প্রভাব কীর্তন গায়ক বা শ্রোতা কারও উপরেই পড়ে না।

অনেক কীর্তনীয়া কৃষ্ণের পালাকীর্তন গাইতে গাইতে হাউ হাউ করে কাঁদেন। সঙ্গে ভক্তরাও কাঁদেন। ভাবেন কি ভক্তি কি আবেগ। এর কোন তুলনা নেই। কীর্তন শেষ হয়ে যাবার পর ওই কীর্তনীয়াকে বলুন—গ্রামে মন্দির হচ্ছে আপনি ১ হাজার টাকা কম নিন। দেখবেন সে ভক্তিও নেই আবেগও নেই। অনেক কীর্তনগায়ক পুরো টাকা না পেলে স্টেজে ওঠেন না। সবই লীলা। রাতের পর রাত এই চলছে। কোন গ্রামে কীর্তন করতে গিয়ে সেই গ্রামের একটি মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে কীর্তনীয়া এমন খবরও পাওয়া যায়। কৃষ্ণনামের প্রভাব থাকলে এমন হতো না। কীর্তনগায়কদের কটাক্ষ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কীর্তন গান অত্যন্ত কঠিন সেটাও বুঝি। তাদের শ্রদ্ধা করি। আমি শুধু বোঝাতে চাইছি যে শুধু নামের কোন প্রভাব নেই।

শ্রোতা হিসাবে যারা কীর্তনের আসরে যান তাদের বেশিরভাগই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তারা অবশ্যই আমাদের

নমস্য। অনেকেই কীর্তন শুনতে বসে হাউ হাউ করে কঁদেন। আমরা ভাবি আহা কি ভক্তি, কি আবেগ। কীর্তনের আসরে অঝোরে কঁদছেন, হরি হরি করছেন-এ জগত মায়া প্রপঞ্চ, সবই ঈশ্বরের লীলা—সকলেই আমরা মায়ায় আচ্ছন্ন এসব কথা শুনেছেন। এমন সময় কোন ভক্তকে কানে কানে ফিসফিস করে বলুন—দাদু আপনার পকেট থেকে দুটাকা পড়ে গিয়েছে অথবা আপনার বাড়ির ধান চড়ুই এ খাচ্ছে, দেখবেন আবেগ মায়া প্রপঞ্চ সব হাওয়া। কীর্তনের আসর ছেড়ে দাদু তখন দুটাকা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। জানি এগুলো শুনতে খারাপ লাগবে, কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করি কি করে। কীর্তনের আসরে অনেকেই খুচরো নিয়ে যান শেষ হলে ছুঁড়বেন বলে। রাজরাজেশ্বর কৃষ্ণ যেন ভিখারী। আমাদের দেওয়া খুচরো পয়সায় কোন রকমে বেঁচেবর্তে আছেন। এভাবেই চলছেদিনের পরদিন রাতের পর রাত। যে কারণে কীতর্নগান দিনের পর দিন হলেও তার কোন প্রভাব পড়ছে না সমাজে। সত্যি নেই বলে। কীর্তন সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সংগীত। তবুও ভণ্ডামো দিয়ে মোড়া বলে কিছু প্রভাব নেই। অথচ নিকৃষ্ট মানের গানও জনপ্রিয় হচ্ছে। কারণ সেখানে লুকোছাপা নেই, ভণ্ডামো নেই, যা বলছে সোজাসুজি।

হিন্দী সিনেমার গানের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে একটা কথা চালু আছে। নায়ক-নায়িকা যে কথা সরাসরি বলতে পারে না, সেকথা গানের মধ্য দিয়ে বলে। এটাই রীতি হয়ে গেছে। সঙ্গমের ইচ্ছা আছে কিনা জানার জন্য নায়ক নায়িকাকে বলে — বোল রাধা বোল সঙ্গম হোগা কি নেহি। অথবা চুমু খাবার ইচ্ছা হলে সরাসরি না বলে গানে গানে বলে — চুমা চুমা দে দে চুমা। এসব গান আমাদের বহুবার শোনা। এমন অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। কীর্তনের মধ্যেও প্রায় একই রীতি দেখা যায়। কামার্তকৃষ্ণ গানে গানে রাধাতে বলছেন — 'নিবিড় স্তন পীড়নানি' — নিবিড় স্তনেতে পীড়া দেহ মোর অঙ্গে। অথবা — তোমার সঙ্গম সখি বঞ্চিত অন্তরে। এছাড়াও কুচবন্ধ দুইহাতে করিয়া লম্বিত-অধরের সুধাপানে হইলা মোহিতা, এর সরল বাংলা না করাই ভালো। কীর্তনগানের মধ্যে জনপ্রিয় পালা নৌকাবিলাস। বিষয় নৌকার ঘাটে কৃষ্ণ বসে আছে মাঝি সেজে। নানা অছিলায় রাধাকে আনা হলো ঘাটে। রাধা নৌকায় চেপে যমুনা পার হচ্ছে। মাঝ যমুনায় ইচ্ছা করে নৌকা নাড়িয়ে দিলেন কৃষ্ণ, ভয় পেয়ে রাধা জড়িয়ে ধরলেন। এরপর যতরকম ভাবেই তত্ত্বের অবতারণা করা হোক কৃষ্ণকে প্রতারক ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় কি? রাতের পর রাত আমরা কৃষ্ণের এই প্রতারণার কথা শুনি আর মজা পাই।

আমি জানি বৈষ্ণব ভক্তরা বাবাজী গুরুজীরা বলবেন আমি অতি পাষণ্ড এবং দুর্মতি। এসবের সূক্ষ্মতত্ত্ব আছে। সেই সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝতে হবে। এসবই ঈশ্বরের লীলা। সূক্ষ্মতত্ত্ব সবার জন্য নয়। এ হলো আরেক চালাকি। গীতগোবিন্দ অনুসারে যদি কোন প্রবল ভক্ত পড়ে যে রাধার স্তন তালের থেকেও বড় তাহলে সে কিভাবে তার মধ্যে সূক্ষ্মতত্ত্ব অথবা ভগবৎ তত্ত্বের অনুসন্ধান করবে তা স্পষ্ট নয়। অন্তত সাধারণ বুদ্ধিতে এর কোন ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। আর যদি ধরে নিই বৈষ্ণবরা সবাই অসাধারণ সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন তাহলে আমরা আমাদের চারপাশে গাদা গাদা ভালো লোক দেখতে পেতাম। তাও তো দেখিনা। সুতরাং এই নির্জলা ভণ্ডামি টেকার নয়। আমি আবার বলছি রাধাতত্ত্ব বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে এনিয়ে কোন সংশয় নেই। কিন্তু পুরো একটা সমাজকে একটা জাতিকে একটা ধর্মকে খোঁড়া করে দিয়েছে—এনিয়েও সন্দেহ নেই।

এ দেশের বিভিন্ন বাবাজীর ধারণা হরিনামে অসীম ক্ষমতা আছে। আমরা তা বিশ্বাস করি। এইসব বাবাজীদের মধ্যে অনেককে অনুরোধ করেছিলাম—আসুন না সেই অসীম শক্তির এটুকু পরীক্ষা হয়ে থাকে। যা পরীক্ষিত নয় তা বিশ্বাস করি কেন। রামকৃষ্ণকেও তো বিবেকানন্দ পরীক্ষা করেছিলেন। রামকৃষ্ণ বলেননি এটা বাজে কাজ। শাস্ত্রেও আছে যাকে গুরু করবে তাকে পরীক্ষা করবে। ফুটবলে বিশ্বের মানচিত্রে ভারতের কোন জায়গাই নেই। মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে অখণ্ড অষ্টপ্রহর হরিনাম হোক। যদি একবার জায়গা পাওয়া যায়। অলিম্পিকে প্রায় শ তিনেক খেলোয়াড় যায়। ভারত থেকে। সব মুখ চুন করে বাড়ি আসে, যাবার আগে যদি সবাই মিলে হরিনাম করা হয় তাহলে কি পদক সংখ্যা বাড়বে। বাবাজীরা এসব শুনলেই রেগে যান। বলেন এসব বাহ্য জগৎ এর ব্যাপার। হরিনাম আধ্যাত্মিক

ব্যাপার। বিচিত্র ন্যাকামি। এসব বাবাজীদের বলুন—অমুক গ্রামের অমুক ক্লাব থেকে আপনাকে কৃষ্ণনাম প্রচারের জন্য সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। দেখবেন কি গদগদ ভাব। কি সাজগোজ, তিলক ফোঁটা লম্বা, ইস্ত্রি করা গেরুয়া, তখন আর যশ প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা মনে হয় না। শিষ্য বাড়ানোর ব্যাপার আছে। অনেক আশ্রমের এজেন্ট ছাড়া আছে গ্রামে গঞ্জে। ঠিক যেমন বিভিন্ন কোম্পানী রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকে। আধ্যাত্মিকতার নাম গন্ধ নেই। অনেকে তা নিয়ে গর্ব করে। আমি এখন অমুক আশ্রমের ইয়ে। আমার শিষ্য করার ক্ষমতা আছে। বহুজনকে বলতে শুনি! মনে হয় শিষ্য বাড়ানো মানে ব্যবসা বাড়ানো মূল লক্ষ্য। অন্য কিছু নয়। যার জন্য অসীম অধ্যাত্মপুরুষরাও দুনম্বরী ব্যবসায়ীদের কৃপাপ্রার্থী হন।

কৃষ্ণনাম আর রাধাতত্ত্বের জন্য বলির পাঁঠা করা হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে। এসব বিচিত্র ব্যাপার। কৃষ্ণ নাম আর রাধাতত্ত্ব প্রচারের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর বড় ভূমিকা আছে। কিন্তু এতো অন্ধের হস্তী দর্শনের মত। তাঁর জীবনের একটি মাত্র দিক দেখে আমরা মেতে গেলাম। অথচ যে কারণে কৃষ্ণনাম প্রচারের সুযোগ পেল, সেটাকেই বিলকুল ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম যে চৈতন্যদেবই বাংলায় প্রথম প্রতিবাদী মিছিল ও শ্লোগানের প্রবর্তক। তার সেই ক্রোধী প্রতিবাদী রূপটিকে আমরা ভুলে গেলাম। তার ধর্ম আর মন্দির সংস্কারের রূপটিকেও ভুলে গেলাম। মনে রাখলাম কেবল হরিনাম।

নবদ্বীপে যখন কৃষ্ণনামের সূচনা হচ্ছে তখনই তাকে বন্ধ করার চেষ্টা করল কাজী। সন্ধে বেলায় হরিনামের আসরে গিয়ে, মৃদঙ্গ খোল করতাল ভেঙে দিল। হরিনাম বন্ধের হুকুম দিল। অজস্র গালাগালি করল। হুমকি দিয়ে গেল যে ফের যদি কেউ কীর্তন করে তবে দেখে নেওয়া হবে। এসব শুনে বৈষ্ণবরা ভয়ে চুপ করে গিয়েছিলেন। কাজী বুঝেছিলেন আঁতুড়েই যদি কৃষ্ণনাম বন্ধ করে দিতে পারি তাহলেই কাজ হবে। কেউ মাথা তুলবার সুযোগ পাবে না। কিন্তু চৈতন্য বুঝেছিলেন এখনই যদি এর মুখের মত জবাব দিতে না পারি তবে কৃষ্ণনাম আর জগতে প্রচার করা যাবে না। সুতরাং কাজীর ধমকে চুপ করে বসে থাকলে হবে না। মানুষকে এক করতে হবে। সেইমত তিনি সকলকে এক জায়গায় করে বিশাল মিছিল নিয়ে গেলেন কাজীর বাড়ি। অজস্র মশাল। এমনকি অনেকে কাঁচা আমের ডাল নিয়ে। একালের ভণ্ড নিরীহ বৈষ্ণবদের মত তা নিতান্ত নিরামিষ মিছিল ছিল না। কেউ বলছে চল—কাজীর ঘরদুয়ার সব পুড়িয়ে দিই—কেউ বলছে—ভাঙ্গিব কাজীর ঘর কাজীর দুয়ার। এসবে মহাপ্রভু কিন্তু কাউকে বাধা দেননি। সমস্ত বৈষ্ণব পণ্ডিতদের এক করেছিলেন চৈতন্যদেব। কাজীর বাড়ি গিয়ে তার ঘরবাড়ি ভাঙা হল লাথি মেরে। ঘর ভাঙ্গ—প্রভু বলে বারবার। চৈতন্যের নির্দেশ পেতেই কাজীর ঘর বাড়ি বাগান সব ছারখার করে দেন কৃষ্ণভক্তরা। কাজী পালিয়ে যায়। পরে ভয়ে চৈতন্যের সাথে আপন করে নেয়। অনেকটা মুচলেখা দিয়ে।

এই হলো বীরের মত শক্তি প্রদর্শন। শুধু এই ঘটনার জন্য চৈতন্যকে মনে রাখা উচিত। সেদিন যদি চৈতন্য প্রতিবাদী না হতেন তাহলে আজ আর টিকি রেখে গেরুয়া পরে কাউকে হরিনাম করতে হতো না। চৈতন্যদেব ছিলেন ভক্ত কিন্তু বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন এবং যুক্তিবাদী। একালের বৈষ্ণবরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ভয় পায়। কারণ এরা অবাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন এবং আবেগবাদী। অবশ্য চৈতন্যভাগবত অনুসারে সেদিন যারা প্রতিবাদ করতে ভয় পেয়েছিল তাদের ভণ্ডই বলা হয়েছে। মর্কট বৈরাগী।

আমাদের উচিত ছিল আমরা যারা কৃষ্ণ আর মহাপ্রভুর উপর আস্থা রাখি তাদের প্রত্যেকের এই ঘটনা মনে রাখা। এই ঘটনা স্মরণে প্রতিবছর বিভিন্ন জায়গায় আমরা বিশাল মিছিল করতে পারতাম, খোল করতাল নিয়ে, সমস্ত বৈষ্ণবকে আমরা এই ইস্যুতে অন্ততঃ বছরে একবার একত্রিত করতে পারতাম। শাসকদল ভয় পেত। বৈষ্ণব ধর্মের উপর আক্রমণ করার সাহসও পেত না। অথচ আমরা ত ভাবতেই পারি না। কারণ এই সব করতে হলে চৈতন্যদেবের মত সাহসী হতে হবে। শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদলে হবে না। কোন ভণ্ডামো চলবে না, চরিত্র দৃঢ় হতে হবে, এর কোনটাই আমাদের নেই। আমরা ভণ্ড, আমরা শুধু কাঁদতে পারি। তাই চৈতন্যের জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—দেশের জন্য ধর্মের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়টিকে চৈতন্যের জীবন থেকে প্রায় মুছে দিতে পেরেছি।

নিজেদের ন্যাকামো ভণ্ডামো আর ফ্যাঁচর ফ্যাঁচর কান্না দিয়ে, যে ঘটনা পুরো ধর্মটাকে বাঁচিয়ে দিল সেই ঘটনাকেই আমরা পাত্তা দিলাম না এটাই আমাদের চরিত্র।

যে বৃন্দাবন কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র সেই বৃন্দাবনেচৈতন্যদেবগিয়েছিলেন ১৫৯৬ সালে। ইতিহাস তাই বলে, তখন গিয়ে তিনি দেখতে পাননি কেউ খঞ্জনি আর খোল নিয়ে কীর্তন করছে। তার আগেই সেখানকার সমস্ত প্রাচীন মন্দির দেবস্থানবিগ্রহ সব ধ্বংস করেছিল দুষ্কৃতিরা। রূপ গোস্বামী আক্ষেপ করে বলেছিলেন—যদুপতেঃ কঃ গতাঃ মথুরাপুরী। ব্রজমণ্ডলে ৮৪ ক্রোশ এলাকার মধ্যে মন্দির ছিল ১২টি। বৃন্দাবনে একটিও ছিল না। চৈতন্যদেব এসব দেখে বলেননি তমাল তলায় বসে কীর্তন করো। তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে ধবংসস্তুপ থেকে মন্দিরগুলি খুঁজে বার করেছিলেন, সেখানে নতুন করে মন্দির তৈরিতে ব্রতী হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের দেখে অনেকেই বৃন্দাবনে মন্দির উদ্ধার ও তৈরিতে মন দেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বল্লভাচার্য, বিঠ্ঠলনাথ, গোপীনাথ, হিত হরিবংশ, ও হরিদাস বাবাজী।

চৈতন্যের এতবড় উল্লেখযোগ্য কাজটাকেও আমরা বেমালুম চাপা দিয়ে রেখেছি। এখন বহু কৃষ্ণ মন্দির উদ্ধার করা বাকি। ভণ্ড বৈষ্ণবেরা উদ্ধার করা তো দূরের কথা সেগুলির নাম পর্যন্ত করে না। যদি শিষ্যরা ছেড়ে দিয়ে পালায়। মন্দির উদ্ধারের কথা বললে শিষ্য কমে যেতে পারে। তাছাড়া ওসব কথা বলতে সাহসের দরকার। সৎ চরিত্র শক্তি দরকার। সে সব আমাদের নেই। তার চেয়ে দুহাত তুলে কাঁদা অনেক সহজ। তাই চৈতন্যের মূল আদর্শকে ভুলে গিয়ে আমরা আমাদের মত হয়ে গেলাম। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার কথা ভুলে গেলাম। বাবাজীতে বাবাজীতে মুখ দেখাদেখি নেই। এ আশ্রম বলে ওরা খারাপ, ও আশ্রম বলে এদের কাজ ভালো নয়। সবাই কিন্তু কৃষ্ণভক্ত। এই চলছে সমানে।

কৃষ্ণভক্তদের কাছে একটি শব্দব্রহ্ম বেশ পরিচিত। 'বৈষ্ণববিনয়'। এই সাংঘাতিক শব্দ তিলে তিলে নষ্ট করছে কৃষ্ণভক্তদের। একটা সামগ্রিক জাতির মেরুদণ্ড নষ্ট করছে। বৈষ্ণববিনয়। সাধারণভাবে বৈষ্ণববিনয় বলতে বৈষ্ণবরা যা বলেন তা হলো—বৈষ্ণবদের উপর যেমনই অত্যাচার হোক সে যতই গালাগালি দিক, বৈষ্ণবরা কিছু বলবেন না। এটি বৈষ্ণবদের গুণ নয়, বদগুণ। যে যেমনই অপমান করুক তা সহ্য করতে হবে—এটা কে বললো। এতো দুর্বলতা কাপুরুষতা, ভীরুতা, বীর্যহীনতার লক্ষণ। এ বৈষ্ণববিনয় তো দেশ ও সমাজকে ধ্বংস করার সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। কৃষ্ণের নামে বৈষ্ণবরা সেই চক্রান্তের শিকার। আর এভাবেই কৃষ্ণের ভক্ত হিসাবে আমাদের সিংহ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু হলাম মেষশাবক। মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলে এমনই হয়। শুধু ঘরের কোণে হরিনাম আর পড়ে পড়ে মার খেতে শিখেছি। কৃষ্ণভক্ত হওয়া তো দূরের কথা কুরুক্ষেত্রের মাঠ ঝাঁট দেওয়ার যোগ্যতাও আমাদের নেই। এই কৃষ্ণভক্তরা শুধু যে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন এমন নয়-সমগ্র দেশ ও জাতির সর্বনাশ ডেকে এনেছেন।

'বৈষ্ণববিনয়' এই চরম ও চূড়ান্ত ধাপ্পাবাজি যেমন শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে ছিল না, তেমনই ছিল না শ্রীচৈতন্যের চরিত্রেও। ভগবান এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের মধ্যে যে এসব বৈষ্ণববিনয়-টিনয় ছিল না তার অজস্র প্রমাণ বর্তমান। সেগুলো আগে বলেছি। এখন দেখা যাক যাকে উপলক্ষ্য করে বৈষ্ণববিনয়ের এই ধাপ্পাবাজি চলছে সেই চৈতন্যদেব ও তার ভক্তরা কতটা বিনয়ী ছিলেন।

বৈষ্ণব বাবাজী এবং মাজীদের ধারণা, চৈতন্যদেব শুধু প্রেমের অবতার। তিনি সারাজীবন শুধু প্রেম বিলিয়ে গেছেন। অনেক বৈষ্ণব আবার এমনভাবে উপস্থাপিত করেন, যেন শ্রীচৈতন্যদেব বনগাঁ লোকালের হকার। দাদা প্রেম দেব নাকি। দুটাকায় পাঁচটা। খোদ নবদ্বীপের তৈরি। বিশুদ্ধ গঙ্গাজল আর মাটি দিয়ে দেব নাকি দাদা। বেশী নিলে তুলসীর মালা ফ্রি। হকাররা যেমন এর ওর গুঁতো খেয়েও ধনেপাতা দেওয়া লজেন্স অথবা পেট খারাপের ওষুধ বিক্রী করেন চৈতন্যদেব যেন তেমনই প্রেমের ফেরিওয়ালা ছিলেন। প্রেম যেন দমদমের লজেন্স। যত চুষবেন তত রস। চুষতে থাকুন। আর গুঁতো খেতে থাকুন। প্রেমের কি মাহাত্ম্য।

শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রে যে বৈষ্ণববিনয় ছিল না তার রাশি রাশি প্রমাণ আছে। সেদিন এক মহাগুরু বৈষ্ণব বাবাজী বল্লেন—দেখুন জগাই-মধাই কলসীর কানা দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছেন তবু চৈতন্য তাদের প্রেম দিয়েছেন। বাবাজীকে বললাম-না জেনে এগুলো প্রচার করেন কেন? তাকে অনেকগুলি চৈতন্যজীবনী খুলে দেখলাম। শ্রীচৈতন্যের মাথা ফাটেনি। মাথা ফেটেছিলো নিত্যানন্দ অবধূতের। নিত্যানন্দের মাথা ফাটার খবর শুনে শ্রীচৈতন্য ছুটে আসেন। এসে দেখেন রক্ত পড়ছে। আর তারপর — "রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি মনে,

চক্র চক্র চক্র প্রভু ডাকে খনে খনে। "

ভাগ্যিস সেদিন অন্যান্যরা ছিলেন। নইলে শুধুমাত্র মদ্যপ অবস্থায় মাথা ফাটানোর অপরাধে জগাই-মাধাইকে কচুকাটা করতেন প্রেমের অবতার চৈতন্যদেব। বৈষ্ণববিনয়ের লেশমাত্র সেদিন দেখা যায়নি। আবার শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিশ্বরূপ দেখিয়ে মাঝে মাঝে হুমকি দিতেন— তেমনই মাতাল জগাইকে শ্রীচৈতন্য শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী রূপ দেখিয়েছিলেন। তবে শান্তি, তবে প্রেম।

শ্রীচৈতন্যের ছোটবেলার কথা যাঁরা পড়েছেন, তারা জানেন একদিন চান করতে যাবার আগে চৈতন্য মাকে তেল চেয়েছিল। দিতে দেরী হবে শুনে বাড়ির সমস্ত জিনিস ভেঙে তছনছ করেছিল। চৈতন্যভাগবতে তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এখন এগুলোকে যতই ভগবান বা ঈশ্বরের লীলা বলা হোক—এই চরম ক্রোধ বৈষ্ণববিনয় নয়।

রামচন্দ্র খান নামে উড়িষ্যার এক জমিদার ছিলেন। তিনি বৈষ্ণবদের নিন্দে করতেন। একবার তার রাজত্বে তিনি বৈষ্ণব মহান্তদের উপযুক্ত সম্মান করেননি। সেখান থেকে চলে যাবার সময় বৈষ্ণবরা মহান্তকে দেখে নেবার হুমকি দেন।

এর দু-একদিন পরই ঐ এলাকার মুসলমান উজির রামচন্দ্রের জমিদারি আক্রমণ করেন। তার দুর্গামণ্ডপে গরু কাটেন। শুধুমাত্র দুর্গামণ্ডপে গরু কটাই নয়। তার স্ত্রী পুত্রকে বেঁধে রেখে তিনদিন ধরে তার বাড়িতে সেই গরু রান্না করে খায় মুসলমানরা। এ ঘটনার পিছনে বৈষ্ণবদের মদত ছিল না তা কে বলতে পারে। কারণ এরপরই বৈষ্ণবদের অভিশাপ — 'মহান্তের অপমান যে দেশ গ্রামে হয়।

এক জনার দোষে সব দেশ উজাড়য়। "

এরপরও যদি কেউ বলেন বৈষ্ণববিনয়—বৈষ্ণবরা সব প্রেমের অবতার তাহলে তাদের কী বলা যাবে। ভণ্ড অথবা খোজা। আসলে এই ধরণের কৃষ্ণভক্তরা ধান্দাবাজ এবং ধাপ্পাবাজ।

অনেক বৈষ্ণব বলেন, চৈতন্যের নামের যাদুতে মুসলমান থেকে হিন্দু হয়েছিলেন যবন হরিদাস। তাকে নিয়ে কি মাতামাতি। অথচ সে সময় হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান হয়েছে। নামের জাদুতে বাঘসিংহের চোখে জল শুধু মুসলমানদের অত্যাচার কমানো যায় নি। তাই বোধহয় চৈতন্যকেও বাংলা ছেড়ে পালাতে হয়েছিল উড়িষ্যার হিন্দু রাজার নিরাপদ আশ্রয়ে।

কৃষ্ণ একটা পূর্ণ জীবন একটা পূর্ণ সমাজের ছবি এঁকেছেন গীতায়। আমাদের উচিত ছিল দেশের স্বার্থে ধর্মের স্বার্থে স্কুলে কলেজে গীতা পড়াবার আন্দোলন শুরু করা। আমরা পারিনি। কারণ নিজেরাই গীতা পড়িনি। বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাপ্রতিদিন গীতার উপর চন্দন দেন ফুল দেন, ফুল চন্দন পেয়ে গীতা ফুলে ওঠে। ভক্তরা কৃশ হচ্ছে। পেটের রোগ, বাত হচ্ছে। গীতা বুড়োদের জন্য নয় তরতাজা যুবকদের জন্য—এই সরলসত্যটাই আমরা বুঝি না। গীতা হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছে স্বাধীনতা যুগের বিপ্লবীরা। তাদের অন্যতম প্রেরণা ছিল গীতা। এগুলো সত্য ঘটনা। আমরা ভুলে যাই। অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা গীতা শোনেন আর কাঁদেন, না বুঝেই কাঁদেন। গীতাতে যে জীবন যে সমাজের কথা বলা হয়েছে আমাদের চারপাশের বৈষ্ণববাবাজী গুরুজী মহাগুরুরা ঠিক তার বিপরীত একটা জীবন একটা সমাজ

তৈরি করেছেন। অনেক গুরুজী ইদানীংকালে আবার গীতা স্বীকারই করতে চাইছেন না। নানা যুক্তি দিচ্ছেন। তাই সমাজের জীবনের এত দুর্গতি। আমরা দেখেও শিখছি না। ঘোর তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়েছে। ভগবান কৃষ্ণকেও প্রায় করে ফেলেছি। ভণ্ডামির চূড়ান্ত। তাই ফচকে ছেলেরা রাস্তায় আমাদের মূলোর মতো টিকি ধরে হ্যাঁচকা টান মারলেও আমাদের বলার কিছু নেই। জীবনটাকে কৃষ্ণভক্তরা এক একটি জোকারে পরিণত করেছে। মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলে এমনই হয়।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—অর্জুন ক্লীবতা ত্যাগ করো। দুর্বলতা ত্যাগ করো। পৌরুষহীনতা ত্যাগ করো। এসব বাজে ব্যাপার। আমরা তাতে কানই দিলাম না। আমরা ক্লীবতা আর কাপুরুষতাকে আঁকড়ে ধরলাম। দুর্বলতাকে মজ্জাগত করে নিলাম। কৃষ্ণ বললেন—সুখদুঃখ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ সুখ থাকলেই দুঃখ থাকবে। দুঃখ থাকলেই সুখ থাকবে। এই সরল সত্যটা মানতে পারলেই জীবন অনেক সুন্দর অনেক সহজ হয়ে যাবে। আমরা পারলাম না। ছোটো খাটো দুঃখেও আমরা হাউ হাউ করে কঁদতে লাগলাম। যুবক ছেলে, দৃপ্ত চেহারা। বান্ধবী প্রেমে না করেছে, ব্যস, তিনদিন খাওয়া বন্ধ। বন্ধুদের কাছে ফুঁপিয়ে কান্না। অথচ ভগবানের কথা অনুসারে আমরা যদি শুধু এটুকু যুবকদের বোঝাতে পারতাম—আমরা অমৃতের অংশ—আমরা মৃত্যুহীন। তাহলে ছবিটা অনেক পালটে যেত। আমার আপনার বাড়ির ছেলেরা অন্তত রকে বসে বসে ফুঁক ফুঁক করে বিড়ি ফুঁকতো না। আর ভগবান কৃষ্ণের নামে আবোল-তাবোল বলতো না। প্রতিটি যুবক যদি জানতো তারা অসীম ক্ষমতার অধিকারী তাহলে তারাও অন্যরকম ভাবতো। আমরা পারিনি। ভণ্ড বলে পারিনি।

কৃষ্ণ বললেন কর্ম করে যাও। ফলের প্রত্যাশা করো না। নিষ্কাম হয়ে কর্ম করে যাও। মনকে নিজের বশে নিয়ে এসো। কৃষ্ণ বললেন—সবসময় কাজ করো, কর্ম না করলে দেহযাত্রা নির্বাহ হবে না, আমরা শুনলাম না। যাতে কাজ করতে না হয় তার জন্য সন্ন্যাসী হয়ে গেলাম। বেশিরভাগ বাবাজী গুরুজিরা সারাদিন কোন কাজ করেন না, শিষ্যরা তাঁর সেবা করেন। তিনি সেবা নিতে ব্যস্ত, কৃষ্ণ বললে কি হবে আমরা শুনলে তো। এর ফলে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় আমরা কুঁড়ে জাতি, চরম কুঁড়ে যুবসমাজ তৈরি করতে পেরেছি। কৃষ্ণ বললেন—যারা শুধু নিজের জন্য রান্না করে তারা মহাপাপী। সাংঘাতিক কথা, এর মধ্যে আছে সমাজচেতনা। সবাই মিলে মিশে থাকার কথা। ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান—আমরা ভুলে গেলাম। পাশাপাশি দুটি কৃষ্ণের আশ্রম দুজন বাবাজী কারো সঙ্গে কারো মুখ দেখাদেখি নেই। এই আমাদের সমাজ চেতনা কৃষ্ণচেতনা। কৃষ্ণ বললেন—সমাজের জন্য যে কাজ করে না। তাঁর জীবনটাই বৃথা। আমরা সমাজ থেকে দূরে গিয়ে জীবন সার্থক করার চেষ্টায় মেতে গেলাম। নিরাপদ জীবন। কৃষ্ণ বলছে বলুক গে। বললেই শুনতে হবে কে বলছে। কৃষ্ণের আদর্শের রূপায়ণ বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হলো শিষ্য বাড়ছে কিনা, ভক্ত বাড়ছে কিনা। শিষ্য আর ভক্ত নিয়ে মেতে গেলাম। কৃষ্ণকেই ভুলে গেলাম। কাজ না করলে ধর্মটাই লোপ পাবে কৃষ্ণ বললেন, আমরা শুনলাম না। অবশ্য কৃষ্ণ এও বলেছেন যারা এই আদর্শের রূপায়ণের চেষ্টা করে না তারা বিবেকহীন ও বিমূঢ়। তাদের বিনাশ হবে, আপাতত এটুকু আশা। এই ভক্তদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণ বললেন—নিজের ধর্মেমরে যাবে কিন্তু পরের ধর্ম ভয়াবহ। রীতিমতো সাবধান বাণী। আমরা শুনলাম না, ভগবানের ভুলটাকে শুধরে নিলাম। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলাম সব ধর্মই সমান। এখনও বলি। না বুঝে বলি। আহাম্মকের মত কথাবার্তা তবুও বলি। যারা সত্য বোঝেন তারা জানেন—আহাম্মকে কি না বলে। সবধর্মসমন্বয়কারীরা হয় পাগল না হয় ধান্দাবাজ।

কৃষ্ণ জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের কথা বললেন। একটা সমগ্র বৃত্ত। জ্ঞান চাই, কর্ম চাই, ভক্তিও চাই। যেভাবে হোক বৃত্ত সম্পূর্ণ চাই। আমরা ভণ্ড তাই শুধু ভক্তি নিয়ে মেতে গেলাম। কৃষ্ণ সবকিছুর কথাই বললেন, আমরা শুধু হরিনামের কথাই বলতে শুরু করলাম। শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরা জ্ঞান লাভ করে। আমরা প্রথমেই শ্রদ্ধাবোধটাকে বিসর্জন দিলাম। প্রকৃত জ্ঞান থেকে অনেক দূরে সরে গেলাম। কৃষ্ণ বললেন—সন্ন্যাসের থেকে কর্মই শ্রেষ্ঠ। আমরা কর্ম ছেড়ে গেরুয়া পরতে শুরু করলাম।

গলায় কণ্ঠী আর কপালে রসকলি নিয়ে সন্ন্যাসী হলাম, কারণ কাজ করা শক্ত। তার চেয়ে সন্ন্যাসী হয়ে খঞ্জনি বাজিয়ে হরিনাম করা অনেক সহজ। কৃষ্ণ বারবার আত্মমননশীল হওয়ার কথা বলেছেন। অর্থাৎ নিজের দিকে তাকাবার কথা বলেছেন। নিজের দোষ ত্রুটি খুঁজে বার করা। আমরা শুধু পরের দিকে তাকাতে লাগলাম। যোগী হওয়ার জন্য গেরুয়া পরার দরকার নেই। টিকি মালা তিলক ঝোলারও দরকার নেই, হরি হরি বলে। সকাল বেলায় তুলসির পাতা তুলে চন্দনে চুবিয়ে গোটা গিলে দেবারও দরকার নেই। প্রয়োজন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে কাজ করা। নিজেই নিজের বন্ধু হও তিনি বললেন আমরা শুনলাম না। ফলে যা হবার তাই হল। আমাদের ভাবার কথা ছিল—আমরা সচ্চিদানন্দ, মুক্তস্বভাব, আত্মস্বরূপ, আমি সেই ভগবান—এ ভাবা কঠিন অতএব বাদ দিলাম। আমরা ভাবতে লাগলাম আর ঠাকুরের সামনে জোড় হাতে বলতে লাগলাম-আমি পাপী, আমার কাজ পাপের কাজ, যা করবো তাও পাপের। ঠাকুর আমাকে উদ্ধার করো, ত্রাহি মম পুণ্ডরীকক্ষ। এতো চিৎকার করছি। ঠাকুর শুনছেন না। আমরা পাপী ভাবতে ভাবতে মহাপাপী হলাম। অনেকে আবার জ্ঞানপাপী। আমরা শুধু এটুকু ভাবতে পারলামনা যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান অমৃতের সন্তান। শ্রীকৃষ্ণের সন্তানরা কখনো পাপী হতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন অতিরিক্ত কিছু ভালো নয়, সবকিছুর মধ্যে একটা ব্যালান্স দরকার। পরবর্তীকাল বুদ্ধদেবও তাই বলেছেন, আমরা শুনলাম না, ব্যালান্স করে চলা কঠিন। আমরা তামসিকতায় আচ্ছন্ন। গোটা পাড়ার ঘুম নষ্ট করে দিনরাত চিৎকার করে হরিনাম করতে লাগলাম। অনেক বাবাজী চরম কৃচ্ছ সাধন করেন, এক টুকরো কাপড় পরেন, কোমরে হাতে গলায় গোছা গোছা তাবিজ কবজ মাদুলি বাবাদুলি, কেউ কেউ বিছানায় ঘুমান না। শক্ত কাঠ তার বিছানা মাথায় থান ইট। এভাবে যে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না সেটা বোঝেন না।

গীতায় চার প্রকার ভক্তের কথা বলা হয়েছে আর্ত, জিজ্ঞাসু, আতর্থী আর জ্ঞানী, সেখানে এও বলা হয়েছে জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। আমরা ভুলে গেলাম। আমরা আর্ততেই আটকে গেলাম। প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিনিয়ত এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ছেলে পরীক্ষা দিতে যাবে কৃষ্ণ ভক্ত বাবা সকালে থাকে উপবাসে। মা শুদ্ধ কাপড়ে হরিনাম করছে। হরিকে ডাকছেন ছেলেকে পাশ করিয়ে দিলে জোড়া মণ্ডা অথবা ডবল পরিমাণ গোকুলদানা দেওয়ার মানত। সেই ছেলে যদি পাশ না করে, অতিবড় কৃষ্ণভক্ত বাবা ভুলেও বলবেন না ফেল করেছে তো কি হয়েছে সবই কৃষ্ণের লীলা। মা বলেন আমি জানতাম পড়াশুনা না করলে কেউ পাশ করে না। এই সরল সত্যটা আগে বোঝেননি। এটাই ভণ্ডামি।

অর্জুন কখনো হরিনাম করেননি। গলায় তুলসীর মালা, রসকলি গেরুয়া ধারণ করেননি। পদে পদে ঠাঁটামো করেছেন। নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন তবুও কৃষ্ণের জীবনে সবচেয়ে প্রিয় অর্জুন। কারণ কৃষ্ণ জানতেন সমাজ ও ধর্মরক্ষা করতে গেলে অর্জুনকে দরকার। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মাঠে অর্জুনকে সব বোঝালেন। অর্জ্জুন সব বুঝলেন। তারপরও অর্জন বললেন তুমিই যদি সব হও তাহলে কই একবার বিশ্বরূপ দেখাও দেখি। জ্ঞানী বুদ্ধিমান ছাত্র হলে এমন হয়। শুধু আবেগের কথাবার্তা নয়। আমাকে প্র্যাকটিক্যাল দেখাও তবে বিশ্বাস করবো। কৃষ্ণ বিরক্ত হননি, দিব্যি দেখালেন, উপযুক্ত মাস্টারমশাই। একালের বাবাজীদের মত ভণ্ড এবং বাক্ সর্বস্ব নন। অর্জুন জ্ঞানী ভক্ত তাই বিশ্বরূপ দেখেছিল কায়দা করে। আমরা ভণ্ড ভক্ত। তাই বাঁশি বাজানো ছাড়া অন্যকোন রূপ দেখতে পাই না।

অনেক বৈষ্ণব বাবাজী গুরুজী আসেন বাড়িতে, সব বাড়িতেই আসেন। আশ্রমের অনুষ্ঠানে নেমন্তন্ন করতে, চাঁদা নিতে। একথা সেকথার পর অবশ্যই বলেন—যাবেন দুপুরে ভালো ভোগের ব্যবস্থা আছে। আদর্শ নয়, আলোচনা নয়, মূল হল ভোগ। রাজনীতির নেতারা বোঝে ভোট, ধর্মের নেতারা বোঝে ভোগ। কোথাও পঞ্চব্যঞ্জন কোথাও একুশ ব্যঞ্জন আবার কোথাও ৫১ রকমের তরকারী। কৃষ্ণ নাকী ভালোবাসতেন। অথচ আশ্রমে ভিখারী নিরন্ন অভুক্ত যাক, ফিরে আসবে। বেশিরভাগ আশ্রমের এটাই বাস্তব চিত্র। দ্রৌপদীর বাড়িতে শাকের এককণা খেয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তাতেই সন্তুষ্ট। ধর্মের নেতা আর রাজনৈতিক নেতাদের বেসিক ক্যারেকটার এক। দুটোই ব্যবসা। একজনের কাঁচামাল হলো ধর্ম আর

আরেক জনের রাজনীতি। ভণ্ডামো দুটোই।

এখন প্রশ্ন উঠবে এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? কৃষ্ণ রাষ্ট্রপুরুষ ভারতবর্ষের জীবন ও সমাজ গঠনের নায়ক। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদ। অসাধারণ কূটনৈতিক দূরদর্শিতায় নিজের ছেলে শাম্বর সঙ্গে দুর্যোধনের মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে। পণের লোভে নয়। তৃণমূল নেতার ছেলের সঙ্গে সিপিএম নেতার মেয়ের বিয়ে হবে এটা এখনও কেউ ভাবতে পারে না। সে যুগে কৃষ্ণ পেরেছিলেন রাজনীতিটা অসম্ভব ভালো বুঝতেন বলে। ভারতবর্ষের সমাজ আর ধর্ম যদি না থাকে তাহলে হরিনামও থাকবে না কৃষ্ণও থাকবে না। যদি সমাজ আর ধর্মরক্ষা পায় তবে হরিনাম বাঁচবে— বৈষ্ণবরা বাঁচবে।

আমাদের শুধু এটুকু বুঝতে হবে যে রাষ্ট্রপুরুষ শক্তিশালী কৃষ্ণের নামেই সারা ভারতবর্ষকে এক করা যায়, ভণ্ডামির আবরণ তুলে রাখতে হবে। আপাতত গোপালকৃষ্ণ, রাধামোহন কৃষ্ণ শিকেয় তোলা থাক, কোন ক্ষতি নেই। দেশ না বাঁচলে ধর্ম না টিকলে এগুলো বাঁচে না। এ সরল সত্য মনে প্রাণে উপলব্ধি করতে হবে। পাকিস্তানে বাংলাদেশে আমরা কোন কিছু দিয়েই রাধামোহন কৃষ্ণকে আদুরে গোপালকে বাঁচাতে পারিনি। সময় থাকতে সচেতন না হলে এখানেও বাঁচাতে পারবো না। কৃষ্ণ আমাদের ধন। ভারত রাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী পুরুষ। চিরকালের সবচেয়ে ভালো রাজনীতিবিদ। এই কথাগুলো বুঝতে হবে বোঝাতে হবে। তাহলে ছবিটা পালটে যাবে, যদি তা না পারি। তাহলে আমরা কিন্তু টিকবো না। তখন ধর্মলীলা, প্রেম। এসব কথা বলার লোক পাওয়া যাবে। না। নতুন জেগে ওঠার সময় হয়েছে। কৃষ্ণকে সামনে রেখে সেটাকে কাজে লাগাতে হবে। সারা ভারত জুড়ে শুরু করতে হবে কৃষ্ণ ভাব আন্দোলন।